# শালিকবুড়ো ও ফড়িং

বাবলু ভঞ্জ চৌধুরী

ওরা দূরে সরে যাচ্ছে। লেখা-পড়ার চাপ, সহজলভ্য মিডিয়া, বাবা-মা কিংবা পারিবারিক সম্পর্কের বক্রতা ওদেরকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। অথচ ওদের মাথায়-ই থাকবে আগামী পৃথিবী।

ওদেরকে কাছে টানতে নয়, ওদের কাছে যেতেই এ প্রয়াস; তা-ই ধরা আছে এই বইয়ের বারোটি গল্পের প্রতি অক্ষরে।

প্রচ্ছদ : নাইমুর রহমান
অলংকরণ : দেলোয়ার রিপন

# শালিকবুড়ো ও ফড়িং

বাবলু ভঞ্জ চৌধুরী

# শালিকবুড়ো ও ফড়িং
বাবলু ভঞ্জ চৌধুরী

ডাংগুলি ৪১/৫০০

**প্রথম প্রকাশ**
একুশে বইমেলা ২০২০

**গ্রন্থস্বত্ব**
লেখক

**প্রকাশক**
মো. জহুরুল হক
ডাংগুলি
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ৫ম তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৬৭৯০০৯৭৮৯, ০১৭৯৭২৭৭৭৬৫

**একমাত্র পরিবেশক**
কলি প্রকাশনী

**প্রচ্ছদ**
নাইমুর রহমান

**অলংকরণ**
দেলোয়ার রিপন

**বর্ণবিন্যাস**
কলি কম্পিউটার

**মুদ্রণ**
জনপ্রিয় প্রিন্টার্স

**মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র**

Shalikburo O Foring by Bablu Bhanja Chowdhury,
Published by Md. Johurul Huque,
Dangguli, 34 Banglabazar, Dhaka -1100.
First Published: Ekushe Book Fair 2020.
Price: 160.00
E-mail: dunguli2016@gmail.com
ISBN : 978-984-93806-5-8

উ ৎ স র্গ

যখন লিখি, ছোট ছোট কতকগুলো মুখ আমার সামনে থাকে। সে আমার মনে মনে। এ মুহূর্তে যাদের নাম মনে আসছে, লিখছি। যাদের নাম মনে আসছে না, উৎসর্গ তাদেরও প্রতি...

অরণ্য, কাব্য, ঝিনুক, শ্রেয়াণ, অক্ষর, রাইসা, সমৃদ্ধি, নিধি,
যাহ্‌রা, তৃষা, তৃণা, রূপন্তী, আদৃত, নির্ঝর, প্রিয়তি, দীপ্তজিত,
কিংশুক, উৎসব, দীপ...

## লেখকের কথা

বাংলা শিশুসাহিত্যে গল্পের পথটি পুরাতন। খুব প্রশস্ত না হলেও, মোটামুটি দীর্ঘ। ঈশ্বর চন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর হাত ঘুরে তা হালে এসে ঠেকেছে। এই দীর্ঘ সময়ে বিষয়ে-ভাষায়-ঢঙে তা পরিবর্তিত হয়েছে। সেই পরিবর্তনের মনের কথা জানতে গিয়ে যা জেনেছি, গল্পগুলো তার-ই ফল।

দুটি গল্প বাদে সব গল্পই বিভিন্ন পত্রিকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। সেগুলোকে একসূত্রে গেঁথে রাখাও এ গ্রন্থের একটি উদ্দেশ্য।

প্রতিভাবান ছড়াশিল্পী ও সুহৃদ আহমেদ সাব্বির, কামাল হোসাইন, মাহফুজ রহমান এবং কলি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী এস এম মহিউদ্দিন কলি ভাইদের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এ গ্রন্থ আলোর মুখ দেখত না, তাঁদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। স্বল্প সময়ে ছবি এঁকে গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণতা দান করেছেন দেলোয়ার রিপন ও নাইমুর রহমান, তাঁদের সহযোগিতা ভোলার নয়।

যাদের জন্য লেখা, তাদের ভালো লাগলে, আর কিচ্ছু চাইনে।

বাবলু ভঞ্জ চৌধুরী

সাতক্ষীরা, ফেব্রুয়ারি, ২০২০
ই-মেইল : bablujbl@gmail.com

## সূ চি প ত্র


| | |
|---|---|
| শালিকবুড়ো ও ফড়িং | ১১ |
| বিচার | ১৪ |
| আসল মামা | ১৮ |
| অন্যরকম টোসো | ২২ |
| বিড়াল ও ব্যাঙ | ২৮ |
| গোল থামানো গোল | ৩৪ |
| ঢ্যাঙঢ্যাঙের বুদ্ধি | ৩৭ |
| পিপির মেয়ে লিকা | ৪২ |
| বন্ধুর কষ্ট | ৪৬ |
| উম চিকি চিকি | ৪৯ |
| মিনু | ৫৪ |
| বৃষ্টি বাগান | ৫৯ |

# শালিকবুড়ো ও ফড়িং

এক ছিল বুড়ো। তার ছিল এক শালিক। তাই তার নাম শালিকবুড়ো।

শালিকবুড়ো প্রতিদিন মাঠে যেত ফড়িং ধরতে। হাতে থাকত কাঁচের বোতল। ফড়িং ধরে কাঁচের বোতলে পুরে নিয়ে যেত বাড়ি। তারপর শালিককে খেতে দিয়ে নিজে চারটে খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোত।

একদিন খাজার মাঠে বেড়াতে এল দূর-মাঠের এক ফড়িং। সবুজ লকলকে ঘাসে খেলা করে সে পড়ল ঘুমিয়ে। বুড়ো তখন পাটকাঠির আগায় জীবলির আঠা লাগিয়ে আস্তে আস্তে ঘুমন্ত ফড়িংয়ের গায়ে ঠেকাল। আর আঠায় আটকে ধরা পড়ল ফড়িং। শালিকবুড়ো ফড়িং ধরে ফড়িংয়ের মতো লাফাতে লাগল আনন্দে। তারপর 'এত্ত বড় ফড়িং আমার শালিকের একদিন হবে' বলতে বলতে ফড়িংটিকে বোতলে পুরে বাড়ির দিকে চলল।

ফড়িং ছটফট করে বলল, 'ছেড়ে দে বুড়ো, নইলে তুই মরে যাবি।' বুড়ো বলল, 'চল, আমার শালিকের পেটে যাবি।' ফড়িং তখন কাতর হয়ে বলল, 'ছেড়ে দাও, তোমাকে মোচার ঘন্ট রেঁধে খাওয়াব, ডুমুরের ডালনা খাওয়াব, আমসত্ত্ব দেব, কাসুন্দি দেব।' শালিকবুড়ো বলল, 'তোর যদি সে সাধ্যি থাকত, তবে ঘাসের মধ্যে লাফালাফি করতিস না।'

ফড়িং বলল, 'বিশ্বাস না হয় ছেড়েই দেখো, এখনই মোচার ঘন্ট খাওয়াব।'

বুড়ো ভেবে-টেবে বলল, 'ঠিক আছে, যদি রাঁধতে পারিস তোকে শালিকের পেটে দেব না।'

শালিকবুড়ো ফড়িং নিয়ে ফিরল বাড়ি। মোটা নাদুস-নুদুস বিড়ালটা দৌড়ে উঠোনে নেমে আদিখ্যেতায় গদগদ হয়ে লেজ বোলাতে থাকল বুড়োর পায়ে। খাঁচার ভেতরে শালিকটা 'খাবখাব' করে লাফিয়ে খাঁচা ভেঙে ফেলার জো করল।

শালিকবুড়ো বারান্দায় ফড়িংয়ের বোতলটা রেখে বলল, 'রাঁধ্ দেখি!'

ফড়িং বলল, 'জিনিসপত্র এনে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও, রাঁধছি।'

বুড়ো বলল, 'জিনিস এনে দেব, আনার পর ছেড়ে দেব, তবে আমার সামনে বসে রাঁধতে হবে, যদি পালানোর চেষ্টা করিস শালিক খুলে দেব, তোকে জ্যান্ত গিলে খাবে...কী লাগবে বল!'

ফড়িং বলল, 'বাটনা বাটতে শিল নোড়ো লাগবে, ঘন্ট রাঁধতে মোচা লাগবে, আর লাগবে তেল নুন।'

শালিকবুড়ো ঘর থেকে ইয়াবড় একটা শিল আর নোড়া এনে বলল, 'এই নে তোর শিলনোড়া, তেল নুন কাছেই আছে, এবার মোচা নিয়ে আসি,' বলেই বুড়ো কলাবাগানে চলে গেল মোচা আনতে।

মোটা নাদুস-নুদুস বিড়ালটা তখন বারান্দায় বসে পা চাটছিল। ফড়িং বোতলের ভেতর থেকে তাকেই বলল, 'আরে ভোম্বল বিড়াল! তুই কী বিশ্রী!' একথা শুনেই বিড়ালের গা জ্বলে উঠল। সব সহ্য করা যায়, কেউ বিশ্রী বলবে—এটা সহ্য করা যায় না। বিড়াল দাঁত-মুখ সিটকে 'ম্যাও...' বলে দিল এক তাড়া। ফড়িং তাড়া খেয়ে দমল না।

বলল, 'ইস! তোর দড়ির মতো গোঁফ, ইচ্ছে করছে ঝুলে পড়ি।' এ কথায় বিড়াল গেল বেজায় ক্ষেপে। রাগে দৌড়ে গিয়ে ফড়িঙের বোতলে মারল এক থাবা। তাতেই ফড়িংয়ের কাঁচের বোতল পাথুরে শিলের গায়ে ঘা খেয়ে গেল ভেঙে। আর ফড়িং সেই ভাঙা দিয়ে বেরিয়ে তিন লাফে লেবুর ঝোপে সেঁধিয়ে বলল, 'বিড়াল তুমি আসলেই সুন্দর।'

## বিচার

সাপ ব্যাঙের মাথা খেয়ে মাথাকুটে বলল, 'এ কাজ আর কক্ষনো করব না।'

ব্যাঙেরা সবাই গলা ফুলিয়ে বলল, 'না না, এমন কথা তুমি অনেকবার বলেছ, কিন্তু কথা রাখোনি, চলো বানরের কাছে, বিচার হবে।'

সাপ আর ব্যাঙেরা মিলে গেল বানরের কাছে।

বানর সব শুনে-টুনে বলল, 'তা সাপ যখন তোদের মাথা খেয়েছে তোরাও সাপের মাথা খা!'

বানরের বিচার শুনে ব্যাঙেরা সব চুপ মেরে গেল। ব্যাঙ খাবে কিনা সাপের মাথা! তা কি হয়! সাপের অতো বড় মাথা। আর ব্যাঙের ছোট্ট ছোট্ট গাল। তাছাড়া ব্যাঙ তো কখনও সাপ খায় না।

সাপ হাসি হাসি চোখে বলল, 'যথার্থ বিচার! নে ! আমি মাথা পেতে দিচ্ছি, আমার মাথাটা খা!'

কুলোব্যাঙ বলল, 'এ কেমন বিচার আপনার! সাপ কামড়েছে বলে আমরা তো অ-ব্যাঙ হতে পারিনা। বরং আপনি সাপকে বলে দিন, সে যেন আমাদেরকে আর না খায়।'

একটা পুঁচকে ব্যাঙ বানরকে বলল, 'আপনি যখন আমাদের উপকার-ই করছেন, তখন আমাদের হয়ে আপনিই সাপের মাথা খেয়ে দিন!'

এ কথা শুনেই বানরের গা গুলিয়ে উঠল। 'ওয়াক থু' করে গজগজ করে উঠল। বলল, 'এই জন্যেই তো তোদের বিচার আমি করতে চাই নে, যা পারিস কর!' বলেই বানর তিন লাফে গাছের মাথায় উঠে কুউ... কুউ... ডাক দিতে লাগল।

সেই ডাক শুনে সেখানে চলে এল এক বাঘ। এই বনে উল্টো নিয়ম। হরিণ দেখলেই বানরেরা এমন ডাক ছেড়ে সঙ্কেত দেয় বাঘদের। বাঘের সাথে বানরের এমনই চুক্তি। কিন্তু বাঘ তো হরিণ দেখতে পেল না; তার পরিবর্তে দেখল ঘাস-পাতার মধ্যে কতকগুলো চোখমোটা শুকনো-মুখো ব্যাঙ; আর তাদের সামনে তাগড়া একটা সাপ। দেখেই বাঘ মুখ তেতো করে বলল, 'যতসব অখাদ্য! তোরা কি জঙ্গল কিনে নিয়েছিস? এখানে জড়ো হয়েছিস কেন?'

সাপ বলল, 'বিচার যা করার সব বানর সাহেব করে দিয়েছেন, আপনার আর এর মধ্যে না এলেও চলবে।'

বাঘ বলল, 'কীসের বিচার?'

ব্যাঙেরা বলল, 'আপনি জঙ্গলের অধিপতি, আপনিই বিচার করুন! সাপ চুক্তি ভঙ্গ করে আমাদের ধরে ধরে খাচ্ছে, তাই এসেছিলাম বানরের কাছে বিচার চাইতে। কিন্তু বানর আমাদেরকেও সাপ খেতে বলে, আপনিই বলুন তাই কি হয় কখনও!'

বাঘ শুনে-টুনে বড় একটা হাই তুলে বলল, 'বিচার-আচারে আমার কাজ নেই, ' বলেই লেজ তুলে ছুট দিল।

এদিকে কেউ ব্যাঙের কথা শুনছে না দেখে সাপটা আনন্দে বেশ লাফাচ্ছে। হোহো করে হাসছে। শয়তানি চোখে তাকাচ্ছে। তার লোভও বেড়ে যাচ্ছে। ফিস ফিস করে বলছে, 'এ ব্যাঙগুলো সব আমার!' একবার মাথা পেতে দিচ্ছে। বলছে, 'খা দেখি!' একবার এখানে গা গড়াচ্ছে, একবার ওখানে গা গড়াচ্ছে। ইচ্ছে করে ধুলো মাখছে। চিৎ হচ্ছে। কাৎ হচ্ছে। এভাবে লাফালাফি করতে করতে সাপের লেজের কিছুটা ঢুকে গেল একটি ঝোপে। ঝোপের মধ্যে ছিল একটা বেজি। সে হেতাল পাতা ভেবে সাপের লেজটা খপ করে ধরে

টানতে লাগল। সাপ প্রথমে থতমত খেল, তারপর বেজায় ভয় পেয়ে হিম হয়ে গেল। কিন্তু বুঝতে দিচ্ছে না। মুখটা হেসে বেলে মাছের মতো হাঁ-করে আছে। এদিকে বেজিটা যত টানছে, সাপ তত ঝোপের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। তাই দেখে ব্যাঙেরা সব বলল, ' কী ব্যাপার! বিচার শেষ হলো না, তুমি লুকোচ্ছ যে!'

সাপের মাথাটা ঝোপের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'বিচার!...আমার বিচার কে করবে?' সাপের মাথাটা ঝোপের মধ্যে একেবারে ঢুকে গেল।

কিছুক্ষণ পরে বেজিটা মুখ চাটতে চাটতে ঝোপ থেকে বের হল। তাকে দেখেই ব্যাঙেরা জিজ্ঞেস করল, 'সাপটা ঝোপের মধ্যে কী করছে?'

বেজি বলল, 'সাপ বলছে, ''ব্যাঙ আর কখনও খাব না, তাই ব্যাঙের রাজ্য ব্যাঙেদের ফিরিয়ে দিয়ে চললাম।'''

# আসল মামা

উঁচু নারকেল গাছ। তার গোড়ায় সাপ আর ব্যাঙ হঠাৎ মুখোমুখি। সাপ দেখে ব্যাঙের চোখ ভয়ে ফেটে যাচ্ছে। আর ব্যাঙ দেখে সাপের চোখ লোভে তেতে উঠছে।

ব্যাঙের সামনে বড় একটা শিকড়। সাপ গাছের আড়াল থেকে অর্ধেকটা বেরিয়ে আছে। হাঁ-করা মুখ। লকলকে জিভ। কেউ কারো থেকে চোখ সরাচ্ছে না।

ব্যাঙ এখানে উদ্বাস্তু। সে থাকত পাশের পুকুরে। সকালে বেরিয়েছিল খেলা করতে। এসে দেখে পুকুর নেই। বাবা-মা ভাইয়া কেউ নেই। মানুষেরা পুকুর বুজিয়ে দিয়েছে। ছোট্ট প্রাণীর কথা কেউ ভাবেনি। এ তল্লাটে সে-ই একমাত্র জীবিত ব্যাঙ। মনটা এমনিই খারাপ, তার ওপর সামনে মরণ দাঁড়িয়ে।

সাপটা সাড়ে তিন দিন আগে ব্যাঙ খেয়েছিল। খিদেয় পেট চোঁচোঁ করছে। চোখের সামনে ব্যাঙ। এ সুযোগ তো আর ছাড়া যায় না!

সাপ ভাবল, 'কী করে যে খাই! ব্যাঙটা যেভাবে ড্যাবডেবিয়ে চেয়ে আছে, ধরতে গেলেই তো সটকে পড়বে!' সাপ তখন ফন্দি করল। বলল, 'গাছে কে দেখ তো?' ব্যাঙ তখনই প্রায় গাছে তাকাতে যাচ্ছিল। 'ওরে বাপরে! গাছে তাকাই আর তুমি খপ করে ধরো! সেটা হচ্ছে না!' মনে মনে ভাবল ব্যাঙ, বলল, 'গাছে তোমার মামা!'

সাপ থতমত খেয়ে গেল। 'ভারী পাকা তো!' সাপ একটু কেশে বলল, 'আমার আবার মামা কোথায়! ওটা তোর মামা! ভালো করে দেখ, তোর মামা বসে আছে।'

ব্যাঙ বলল, 'আমার মামা তো তুমি।'

ব্যাঙের কথা শুনে সাপ আবার থতমত খেয়ে গেল। বলে কী এ পুঁচকে! সাপ বলল, 'তুই আমাকে মামা বললি! কেউ আমাকে মামা বলে না। আজ থেকে সত্যিই আমি তোর মামা। তুই সত্যিই আমার ভাগনে। আমি তোকে খাব না, কথা দিচ্ছি খাব না।' সাপ সামনের পাতায় মিথ্যে মিথ্যে চোখের জল মুছল। বলল, 'চা! আমার কাছে আবদার করে কিছু চা!'

'কী চাইব মামা?'

'চা, চকলেট চা, আইসক্রিম চা, রসগোল্লা চা, যা ইচ্ছে তাই চা!'

'আমিতো ওসব খাই না। আমি খাই মশা।'

'ও..., তবে তাই চা, মশা চা...কিন্তু এখানে তো মশা দেখছি না। তোকে দেখে হয়তো পালিয়েছে, আচ্ছা তবে তাই চা!'

ব্যাঙ ভাবল, 'বাহ! সাপটা তো বেশ 'সাপবিক', মানে মানবিক। বলল, 'মামা আমি ওসব কিছু চাইনে, তুমি আমার বাবা-মা আর ভাইয়াকে এনে দিতে পার?' সাপ বলল, 'খুব পারি! এসব তো আমার কাছে ওয়ান-টু।' বাবা-মা-ভাইয়াকে ফিরে পাবার আশায় ব্যাঙ গলে গেল। আড়চোখে দেখল সাপ। সাপ ভান ধরে বলল, 'কিন্তু ভাগনে! আমার খাওয়া-দাওয়াতো ডকে উঠেছে, আমি কিছু খেতে পারিনে, গায়ে শক্তি নেই, শক্তি না থাকলে তো...'

'কেন কী হয়েছে মামা?'

'আর বলিস নে! গালের মধ্যে বড় একটা ফোড়া! একটু দেখতো কী অবস্থা!' সাপ চোখ বুজে গাল হাঁ করল।

ব্যাঙ লাফিয়ে লাফিয়ে সাপের গালে ফোড়া দেখতে গেল। আর সাপ খপ করে ব্যাঙকে গালে পুরল। ব্যাঙ ছটফট করে বলল, 'কী

ব্যাপার মামা! তুমি আমাকে খাচ্ছ কেন?' সাপ ভরা মুখে বলল, 'ওরে! তুইতো আমার একমাত্র ভাগনে! তোরে কোথায় রাখি বল! তাই পেটের মধ্যে নিজের সাথে রাখলাম।' সাপ দুই ঢোকে গিলে ফেলল ব্যাঙকে।

সাপের পেটের মধ্যে অন্ধকার। ব্যাঙ রাগে-অভিমানে ফুলে উঠল। চেঁচিয়ে বলল, 'আমার সাথে বেঈমানী! দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা।' ব্যাঙ খুব করে গুঁতো দিতে লাগল সাপের পেটে। কিন্তু কোন কাজ হলো না। আস্তে আস্তে ব্যাঙের শক্তি কমে আসছে। হজম হয়ে যাচ্ছে সে।

এদিকে খিদে মিটিয়ে সাপ বেশ আরামে আছে। সেই নারকেল তলায় শুয়ে আছে। পেটের মধ্যে একটু হুড়ো-তাড়া হচ্ছে; ভাবল, 'খামখা অতো নড়ছিস কেন রে..? একটু পরেই তো হজম হয়ে যাবি!'

ঠিক সেই সময়ে আস্ত একটা নারকেল পড়ল সাপের পিঠে। আর সাপের পেট ফেটে ব্যাঙ বেরিয়ে গেল। সাপের মরমর অবস্থা। ব্যাঙ টলতে টলতে হাঁপাতে হাঁপাতে কিছু দুরে গিয়ে বলল, 'সত্যি আমার আসল মামা গাছের উপরে!'

সাপ অবাক হয়ে নারকেল গাছের উপরের দিকে তাকাল। আর তাকিয়েই জ্ঞান হারাল।

## অন্যরকম টোসো

হু হু করে বইছে ঠান্ডা হাওয়া। তার ওপর চার দিন সূর্যের দেখা নেই। শীতে জবুথবু সব। ক'দিন ধরে শুধু শোয়া আর শোয়া। খেলাধুলা কিচ্ছু হচ্ছে না। মা মোটে বের হতেই দিচ্ছে না। কিন্তু আর শুয়ে থাকতে ভালো লাগে না টোকো'র। টোকো হচ্ছে ছোট্ট একটা টিকটিকি।

টোকো টুপকরে মাথা বের করে দেয় দেওয়ালের ওপর থেকে। হাই তোলে। আড়মোড় খায়, আর মা লেজটা ধরে টেনে নিয়ে যায় ভেতরে।

'কী হলো রে! নড়ে নড়ে বাইরে মুখ বের করছিস কেন?'

'মা একটু দেওয়ালটা ঘুরে আসব? দেখব রোদ উঠেছে কিনা?'

'না, কোনো রোদ নেই, ঠান্ডা লেগে যাবে!'

'রোদ নেই কেন মা?'

'মানুষেরা খেয়ে ফেলেছে।'

'মানুষেরা রোদও খায়!'

'হ্যাঁ খায়, বেশি বকবক করিস না তো, ঘুমো!'

ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না টোকোর। দেওয়ালে একটু হুটোপুটি করলে ভালো লাগত। অনেকদিন দরজার কাছের ওই দেওয়ালটিতে যাওয়া হয় না। ওখানে একটা মাকড়সার ছেলে থাকে। কী কিম্ভুত দেখতে! আজগুবি আজগুবি গল্প বলে সব।

'মা খিদে পেয়েছে, মশা আছে কিনা দেখে আসবে?'

'যাবো তো, কিন্তু এত ঠান্ডায় যাই কী করে? আচ্ছা...কোথাও যাস না, দেখি কাছে কোথাও মশা পাই কিনা।'

মা বেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে টোকোও বেরিয়ে পড়ে। কোমর বেঁকিয়ে লেজ দুলিয়ে দেওয়ালে হাঁটতে থাকে। বেড়ানোর আনন্দে ঠাওর হচ্ছে না শীত। চুড়ুত চুড়ুত করে দরজার দেওয়ালে যায়।...আরে! সেই কিম্ভুতটা আসছে! টোকোকে দেখেই মাকড়সার বাচ্চাটা পথ আটকে দাঁড়াল। ঠেলে বেরুনো চোখ তার। চোখে কেমন শয়তান শয়তান হাসি।

'কী টোকোবাবু! এত সকালে কোথায় যাওয়া হচ্ছে!'

'এই একটু হাঁটছি, রোদ তো সব মানুষে খেয়ে ফেলেছে।'

'মানে!' কিম্ভুতের চোখদুটো লাফিয়ে উঠল।

'মানে মানুষে রোদ খায়! তাইতো রোদ আর নেই, রোদের আশা করলে তো হবে না এখন।'

কিম্ভুত চোখদুটো ডান-বাম করে। ভ্রু'র মাঝটা কুটিল হয়ে আছে। ঠোঁটে দুষ্টু হাসি।

'তাই!'

'হ্যাঁ তাই তো! মা বলেছে!'

কিম্ভুত এক চোখ দিয়ে টোকোকে দেখছে। চোখে ভিষণ দুষ্টমি। বলল, 'তুই পা-তালি দিতে পারিস?'

পা-তালি মানে হাত তালি। টোকোদের তো হাত নেই। চারটেই পা।

টোকো মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ...খুব পারি!'

'দে তো!'

টোকো যেই পা-তালি দিতে গেল, আর অমনি দেওয়াল থেকে খসে টুপ করে পড়ল মাটিতে। পড়েই ভোম হয়ে বসে থাকল কিছুক্ষণ। খুব লেগেছে। কিন্তু এমন লাগা বেশিক্ষণ থাকে না টোকোদের। তবে টোকোর জীবনে এমন আছাড় প্রথম। তাই চোখে জল এসে গেল। ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমানে দেওয়ালের ওপরে কিম্ভুতের দিকে তাকিয়ে পড়ল। কিম্ভুত টোকোকে একটু করে দেখছে, আর

মিচকে মিচকে হেসে ওপরে উঠে যাচ্ছে। কিম্ভুত উঠতে উঠতে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়ে। পা মেলে হড়কে পড়ে যাওয়ার মতো ভঙ্গি করে। তা দেখেই খ্যাকখ্যাক করে হেসে পড়ে টোকো। চোখে সেইভাবে জল টলমল করছে। হাসতে হাসতে দম বেরিয়ে যাচ্ছে। গড়াগড়ি খাচ্ছে। ব্যাথা-ট্যাথা সব উথাও। এরমধ্যে ঝুপঝাপ করে টোকোর ওপর কীসব পড়ছে। টোকো চমকে চমকে উঠছে। চোখে ঘন ঘন পলক পড়ে। কিন্তু গায়ে লাগছে না। নরম নরম লাগছে সব। টোকোর চারপাশ আটকে যাচ্ছে। অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।

মানুষেরা কাচার জামাকাপড় ফেলছে মেঝেতে। টোকো তার মধ্যে আটকে গেল। বের হতে পারছে না। যেদিকে যায়, সেদিকে নরম কিন্তু অভেদ্য দেওয়াল। টোকো কচি পা দিয়ে খুব চেষ্টা করছে; কিন্তু কিছুতেই বের হতে পারছে না। একজন মানুষ কাপড়-চোপড়গুলো বালতিতে ভরবে। বালতিতে জল। সে একহাতের তালুতে গুড়ো মাজন ধরে আরেক হাতের আঙুলে দাঁত মাজছে। মাজন ফুরিয়ে গেলেই টোকোকেসুদ্ধু জলের মধ্যে চুবোবে।

এদিকে টোকো'র মা দুটো মশা নিয়ে ফিরে এল। ঘরে টোকো নেই! সারা ঘর খুঁজে বেড়াল। খড়ের বিছানাটা উল্টে দেখল। টোকো মাঝে মাঝে এর তলায় লুকিয়ে দুষ্টমি করে। কোথাও টোকো নেই! এবার মা'র বুকের ভেতরটা ছ্যাঁক করে উঠল। পড়ে যায় নি তো! মানুষের পায়ের তলায় পিষে যায়নি তো! মশাদুটো টোকো'র বালিশের পাশে রেখে কাঁদতে কাঁদতে ছুটল দেওয়ালে। 'টোকো টোকো' করে মা'র গলা ফেটে যাচ্ছে। টোকোও মা'র গলা শুনতে পেল। সেও 'মা দ্যাখো কিম্ভুত কীসব দিয়ে আমাকে চাপা দিয়েছে ! বের হতে পারছি না' বলে কাঁদতে লাগল। মা দেখল তলার জামা-কাপড়ের স্তূপ থেকে গলার আওয়াজ আসছে টোকো'র। আঁতকে উঠল মা। ওগুলো তো জলে ফেলবে মানুষেরা! টোকোর মা তখন আহাজারী করে সমস্ত টিকিজনদের ডাকল, 'কে কোথায় আছ ! আমার টোকোকে বাঁচাও !'

আমরা যেমন আমাদেরকে মানুষজন বলি, ওরা ওদেরকে টিকিজন বলে। দেখতে দেখতে টিকিজনদের ভিড় পড়ে গেল

দেওয়ালে। গলা উঁচুকরে নিচের দিকে দেখছে সব। টোকো কাঁদছে। টিকিজনদের মধ্যে একজন বয়স্ক আছে। মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। ভালোকরে দেখে বলল, 'বাচ্চাদের দিকে খেয়াল রাখতে হয় না! ওর কাছেই একটা মানুষ! কে যাবে উদ্ধার করতে! গেলেই তো মানুষটা তাকে মেরে ফেলবে!'

একথা শুনে টোকো'র মা 'টাউমাউ' করে কাঁদছে। এর মধ্যে 'কই দেখি দেখি' করে ভিড় ঠেলে এল একজন। মাসখানেক বয়স, টগবগে তরুণ। নাম টোসো। টিকটিকিদের মধ্যে এই টোসো খুব দুরন্ত। শুধু খেলা করে বেড়ায়। এক গা ধুলোবালি মেখে এসেছে। নীচের দিকে দেখছে। ভাব বুঝছে। এরমধ্যে মানুষটা মাজনটুকু শেষ করে হাত ঝেড়ে কাপড়-চোপড়গুলো তুলল। আর নড়া পেয়ে টোকো কেঁদে উঠল। তাই দেখে টোকো'র মা আছাড় খাচ্ছে, 'ওই!... মানুষটা এবার নিয়ে যাচ্ছে! ওকে জলের মধ্যে ফেলে দেবে...!' টিকিজনদের মুখ অন্ধকার। সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছে। টোসো গলা উঁচুকরে ব্যাকুল চোখে দেখছে। মানুষটা দুহাতে কাপড়-চোপড়গুলো ধরে এগোচ্ছে বালতির দিকে। কুঁজো পিঠটা জ্বলজ্বল করছে। বুদ্ধির সাথে চেষ্টা করলে কিছু একটা হবেই। টিকিজনদের জীবন যে ছোট নয়, বাঁচার অধিকার যে তাদেরও আছে, জীবন দিয়ে হলেও তা বোঝানো দরকার। সেটাই বা কম কীসের? দেখতে দেখতে টোসোর সারা শরীর ছোঁ-মারার মতো হয়ে গেল। মুখটা খ্যাপা হয়ে গেল। মানুষটা বালতির কাছে পৌঁছে গেল প্রায় ! টোসো 'ইয়া...টিকি...' বলে নিশানমত দিল এক ঝাঁপ। ঠান্ডা খরখরে চার পা দিয়ে থপ করে পড়ল মানুষটার পিঠে। ঠিককরে পিঠের এমন জায়গায় পড়ল, যেখানে হাত যায়না মানুষের। আর বিদঘুটে ঠান্ডা জীবন্ত কিছুর পরশ পেয়ে সারা গা ঘিনঘিন করে উঠল মানুষটার। তাড়াতাড়ি হাত-টাত দিয়ে ঝাড়তে গিয়ে কাপড়ের ডাঙ ফেলে দিল মেঝেতে। সেই সাথে টোকোও পড়ল আরামছে। ধাক্কা খেয়েই টোকো দেখল সামনে আলো দেখা যাচ্ছে! কাপড়ের দেওয়াল সরে গেছে! টোকো সেই ফাঁক দিয়ে তুড়ুক করে বেরিয়ে চড়চড় করে দেওয়ালে উঠে গেল। মা তো ছেলেকে পেয়ে

নিজের হৃদপিন্ডটাই যেন দেখল প্রথমবার। লেজ দিয়ে ছেলের গা বুলিয়ে দিচ্ছে। টোসো তখনও মানুষটার পিঠে খামচি এঁটে বসে আছে। মানুষটা হাত ছুটোচ্ছে খুব, কিন্তু টোসো পর্যন্ত হাত যাচ্ছে না।

টোকো মুক্তি পেল। এবার ফেরার পালা টোসো'র। টোসো এক ফাঁকে 'ইয়া...টিকি...' বলে দিল এক লাফ। পড়ল দেওয়ালের নীচে। দেওয়াল বেয়ে ওঠার আগেই লোকটা চপ্পল ছুঁড়ে মারল। আর তাতে লেজ কেটে গেল টোসো'র। লেজটা ছটফট করে লাফাচ্ছে মেঝেতে। যন্ত্রণা হচ্ছে। 'যন্ত্রণা টের পাচিছ, মানে বেঁচে আছি, জীবন নিয়ে ফিরতে হবে, ইয়া...টিকি...' বলে খুড়িয়ে খুড়িয়ে দেওয়ালের ওপরে উঠে গেল টোসো।

টিকিজনরা ভয়ার্ত চোখে টোসো'র লাফানো লেজটাকে দেখছে। এতক্ষণ তারা টোকো'র মুক্তিতে আনন্দ করছিল। টোসো'র বীরত্ব উদযাপন করছিল। এখন লেজবিহীন টোসোকে দেখে কেউ কাঁদছে, কেউ ফোঁপাচ্ছে, কেউ ফিসফাস করছে। টোসো সবাইকে এক নজর দেখল। তারপর খুব জোরে দিল একটা তাড়া, 'চোপ! আমি কান্নাকাটি পছন্দ করি না, মনে রাখবেন, আমাদের লেজ আছে বলেই তা খোয়াতে পারি, মানুষেরা শত চেষ্টা করেও তা পারে না।' এ কথা শুনে সবাই ট্যাকট্যাক করে উঠল। এমন কথা তারা কখনোই শোনেনি। তাদের ভয়ডর কষ্ট দূর হয়ে গেল। সবাই ন্যাড়া টোসোকে নিয়ে আনন্দ করতে লাগল। সকল টিকিজনদের মধ্যে অন্যরকম হয়ে থেকে গেল লেজকাটা টোসো।

## বিড়াল ও ব্যাঙ

উঠোন শেষ হলেই আমগাছটা। রাতের বেলা। তপুদের বিল্ডিং থেকে একটা মিহি আলো পড়ছে আমগাছটার একাংশে। তারপরেই অন্ধকার। ঘাসপাতা। আতাগাছ। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক।

একটা ব্যাঙ ওই আমতলায় টাইলসের ওপর বসে ওপর-মুখো হয়ে একটা আম দেখছে। আমটা ডালপাতার বাইরে একা একা ঝুলছে।

বাড়ির বিড়ালছানাটার ঘুম ভাঙল। দেখল, মা সেই ভাবে ঘুমোচ্ছে। কাত হয়ে। চার হাত-পা সোজা করে।

বিড়াল ছানা  গুটিগুটি পায়ে খাটের তলা থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল। নাক টেনে তাকাল টেবিলের দিকে। নাহ, এখনও রাতের খাবার সাজায়নি মানুষেরা। খাবার খেতে এখনো ঢের দেরি। বিড়ালছানা সামনের পা দুটো টানটান করল। মাজা-পিঠ নোয়ালো। লম্বা একটা হাই তুলে আলিস্যি ঝাড়ল। ...'আরে! উঠোনে একটা ব্যাঙ বসে আছে মনে হচ্ছে! যাই!' চট করে বিড়ালছানা নেমে পড়ল উঠোনে।

ব্যাঙ বাবাজি বিড়ালছানাকে দেখে গলা ফোলাতে লাগল। বিড়ালছানা ব্যাঙের পাশে লেজের ওপর বসল। ব্যাঙের গায়ে হাত ছোঁয়াতে গিয়ে ছোঁয়ালো না। বলল, 'ভয় নেই,...বলতো এ বাড়ির মালিক কে?' ভয় কেটে গেল ব্যাঙের। ঘ্যাঙ করে হাসল। বলল, 'এত সোজা প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞেস করে?'

'মানে!'

'মানে বাড়ির মালিক কোলাব্যাঙ!'

'কোলাব্যাঙ!'

'তা নয়তো কী! গায়ে কেমন জোর জানো! আমাকে গর্ত থেকে বের করে দিলো, তাই তো এখানে বসে হাওয়া খাচ্ছি।'

আমের কথা চেপে গেল ব্যাঙ।

'ধুর কোলাব্যাঙ! ধরে আনত! একেবারে কান ছিঁড়ে নেবো! শোন এ বাড়ির মালিক আমি।' ঝাঁঝাঁ গলায় বলল বিড়ালছানা।

হঠাৎ 'ঘড়াঙ' শব্দে ওদের কথাবার্তা থেমে গেল। সবাই তাকিয়ে পড়ল গেটের দিকে। হেডলাইট জ্বালিয়ে ভোঁভোঁ করে ঢুকলো মোটরসাইকেল। তার সাথে একটা মানুষ। স্ট্যান্ড লাগিয়ে হাঁক দিল, 'কই? সব গেলো কোথায়? এই সাবু! আঁকশি নিয়ে আয়, আম পাড়ব!'

ব্যাঙ মোটামোটা চোখে বলল, 'এ আবার কে! কী বলছে?'

'খ্যাক খ্যাক খ্যাক, ভয় করছে? দূর বোকা! আয় আমার সাথে, সব বলছি!' বিড়ালছানা টুপ করে টাইলস থেকে অন্ধকারে নামল। তারপর ঘাসবনের মধ্যে আতাগাছটার গোড়ায় গিয়ে বসল। ব্যাঙটাও উক উক করে লাফিয়ে বিড়ালছানার সামনে বসল। চাপা গলায় বিড়ালছানা বলল, 'ওটা হচ্ছে আমার চাকর, বলছে—মালিক যা বলবে সব শুনব!'

'ওরে বাবা! এ তোমার চাকর! এ তো তোমার চেয়ে অনেক বড়! এত বড় কি কেউ চাকর হয়?'

'হয় রে হয়! চাকররা বড় হয়, শক্তিশালী হয়, কিন্তু বোকা হয়।'

'বোকা!'

'হ্যাঁ বোকা। নইলে কেউ চাকর হতে পারে!'

ব্যাপারটা বুঝে ব্যাঙ আনন্দ পেল। ঘ্যাঙঘ্যাঙ করে হেসে বলল, 'তা তুমি তো মালিক, কী করতে বলেছ চাকরকে?'

'বলেছি আম পাড়তে। দেখবি এক্ষুনি আম পাড়বে।'

ব্যাঙ দেখল সত্যি সত্যি মানুষটা আঁকশি দিয়ে আম পাড়ছে। একটা আমে আঁকশি বাধিয়ে ঘচাং করে দিল টান। আঁকশিতে না জড়িয়ে আমটা সটান পড়ল অন্ধকারে ঘাসের মধ্যে। একেবারে ব্যাঙের ঘাড়ের কাছে। আরেকটু হলে ব্যাঙ বিগ-ব্যাঙ হয়ে যেত। মানে ফেটে যেত। সেই ভয়ে ব্যাঙ 'ওর বাবা! ওরে বাবা!' করতে লাগল।

'খ্যাক খ্যাক খ্যাক, ভয় পেয়েছিস! এ মা! তুই কী ভীতু রে!, আমটা তো আমি এখানেই ফেলতে বলেছি, খ্যাক খ্যাক খ্যাক।' হেসে-টেসে বলল বিড়াল ছানা।

'তবে আমটা আমি নেব মামা?'

'অ্যাঁ! ...তুই কি আম খাস?'

'খাইনা, তবে আজ খুব খেতে ইচ্ছে করছে।'

'কিন্তু আমটা তো তোর চেয়ে বড়, তুই নিবি কী করে?'

'সে—আমি নিতে পারব।'

মানুষটার ছায়ামুর্তি ভুল জায়গায় আম খুঁজছে। চষে বেড়চ্ছে চারদিক। তার গাড় একটা ছায়া পড়ল বিড়াল ছানার চোখে। বিড়াল ছানা বলল, 'ঠিক আছে, যদি নিতে পারিস নে! তবে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যা!'

ব্যাঙ আনন্দে আম ঘাড়ে করতে গেল। কিন্তু কয়েকবার চেষ্টা করে ফেল মারল। এবার পাঁজাকোলা করে 'হেইয়ো' বলে এক ধাক্কায় তুলল পেটের পরে। তারপর আকাশের দিকে মুখ করে মাজা বেঁকিয়ে দুই ঠ্যাঙে নেতিয়ে নেতিয়ে চলল। আমের আনন্দে কষ্টের মধ্যেও 'থ্যাংক ইউ' জানাল বিড়ালছানাকে।

এদিকে মানুষটা আতাগাছের কাছে চলে এল। অন্ধকারে কীসের একটা শিঁকড়ে বেধে পড়ে যাচ্ছিল। আর তক্ষুনি তার ছুটন্ত পা সজোরে ঘা দিল ব্যাঙের গায়ে। এক ঘায়ে ব্যাঙের হাত থেকে আম

গেল ছুটে। মানুষটা 'পেয়েছি পেয়েছি' বলে আম নিয়ে লাফিয়ে চলে গেল। আর ব্যাঙ? ব্যাঙ সেই পায়ের বাড়ি খেয়ে সাঁই করে উড়ে আতাগাছের দুই ডালের খাঁজে গেল বেঁধে। হাত-পা ছুঁড়েও বের হতে পারছে না। চিৎকার করে বলল, 'বিড়াল মামা বাঁচাও! আমার পেট গেল!'

বিড়ালছানা কচুগাছের নীচে বসেছিল। নাকের মশা তাড়িয়ে চোঁ-করে ছুটে এল।

'আরে তুই কোথায়?'

'এই তো, ডালের খাঁজে মামা!'

'ইস! ডালে বেধে গেলি কী করে! তোর কি পাখা আছে!' সোজা হয়ে মাথা উঁচু করে দেখে বলল বিড়ালছানা।

'জানিনে মামা, মনে হলো পৃথিবী উল্টে গেছে, আর আমি ছিঁটকে পড়েছি গাছে।'

'নানা, ব্যাপারটা সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে।'

'সে যা হয় হোক, আগে আমাকে বের করো মামা, বাতাস উঠলেই কিন্তু পেট ফেটে আলুর দম হয়ে যাব!'

বিড়ালছানা সামনের দুই পা আতাগাছের গোড়ায় তুলে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বোঝার চেষ্টা করল।

'কী হলো মামা উঠতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, উঠতে পারব না কেন, এইটুকুতো গাছ!' ক্যাচক্যাচ করে বলল বিড়ালছানা। মনে মনে বলল, 'এমন ঘ্যাচাংকল জীবনে দেখিনি রে বাবা!'

'তোমার চাকরকে ডাকো মামা।'

'নাহ তুই বড্ড ভীতু! এসব ছোটো ব্যাপারে চাকরকে কি কেউ ডা...!'

'ঘে-উ-উ!' ঢোল-ফাটা ডাক হুলোর।

বিড়ালছানা গুটি মেরে গেল। হুলোটা তেড়ে আসছে!

'ওই এল রে!' বলে বিড়ালছানা মারল এক উর্দ্ধলাফ। একলাফে একেবারে আতাগাছের ডালের ওপরে। বিড়ালের ভারে ডাল পড়ল নুয়ে। আর আলগা হয়ে ব্যাঙ ফিচ করে বেরিয়ে পড়ল মাটিতে। ব্যাঙ চিৎ হয়ে পড়ে আছে ঘাসের ওপর। হাঁপাচ্ছে। গলা-হাত-পা কাঁপছে।

'সত্যি তুমি বীর মামা! কী শক্তি তোমার!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ব্যাঙ।

বিড়ালছানা মোটামোটা চোখে তাকিয়ে আছে ব্যাঙের দিকে।

ওদিকে মা-বিড়াল ডাক দিল, 'কোথায় গেলি রে সোনা! উঠোনে বজ্জাত হুলোটা আছে!'

'যাই রে!' বলে বিড়ালছানা চুপিচুপি তিন লাফে বারান্দায় উঠে মায়ের পেটের তলায় লুকোলো।

মা ভুরম্যাও ভুরম্যাও করে লেজ নেড়ে গা চেটে আদর করে বলল, 'কোথায় গিয়েছিলি রে?'

বিড়ালছানা মায়ের লোম থেকে মুখ বের করে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকে অন্ধকার বাগানের দিকে। কোনো উত্তর দেয় না।

# গোল থামানো গোল

ট্যাঙ নামে এক ব্যাঙ ছিল। মা তাকে 'ম্যাঙ' বলেও ডাকত। প্রতিদিন রাত তিনটে'য় তার ঘুম ভেঙে যেত। তখন অবাক হয়ে আকাশ দেখত। আকাশ ভরা তারা দেখে ভাবত–আকাশের ফুল। ভাবত আর হাই তুলত। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ত। খুব সকালে উঠত। পূব আকাশে বড় সুর্য দেখে ভাবত, 'এটা আবার কী?' ভাবত আর মনে মনে বলত, 'এটা হচ্ছে বড় একটা বাল্ব। কেউ টানিয়ে রেখেছে আকাশের গায়ে।' ভেবে-টেবে পুকুরধারে খেলতে যেত। পুকুরে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে হত খুব। কিন্তু পারত না। জলে ট্যাঙ-কে দেখলেই চ্যাঙমাছেরা তেড়ে মারতে আসত।

একদিন খুব মেঘ করেছে। ট্যাঙের দাদী নাকছাবি পরে বর্ষার গান ধরেছে। তার নাম কোলাঘ্যাঙ। কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না। শুধু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আর হুড়ুম-দাড়াম চলছে। গর্তের মুখে বসে ট্যাঙ দেখছে- চড়চড় করে আকাশ চিরে যাচ্ছে। কেউ যেন দু-হাতে আকাশটাকে ধরে কাপড়ের মতো ছিঁড়ে ফেলছে। সেই সাথে কষে মারছে তাড়া। একেকটা তাড়ার শব্দে নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে চারদিক। ট্যাঙ ভাবছে, 'কেন এমন হচ্ছে?' এর মধ্যে চোখ ধাঁধিয়ে আলোর ঝলকানি। সেই সাথে কড়কড় কড়াৎ করে বিকট শব্দ। আর চড়চড় চড়াৎ করে সামনের তালগাছটা এলিয়ে পড়ল মাটিতে। গাছটা পুড়ে যাচ্ছে। কোলাঘ্যাঙ বিবি গান থামাল। ট্যাঙের ঠ্যাঙ ধরে টেনে নিয়ে গেল গর্তের ভেতরে। বলল, 'শিগগির শুকনো ডালের পরে বস!'

ট্যাঙ জিজ্ঞেস করল, 'কেন? শুকনো ডাল কেন?'

কোলাঘ্যাঙ বিবি বলল, 'আকাশে গোলের সময় শুকনো কাঠের ওপর থাকতে হয়।'

ট্যাঙ বলল, 'কাঠ যদি বৃষ্টিতে ভিজে যায়?'

'তখন গেরস্থের কাঠগোলাতে যেতে হয়, ওখানে সব শুকনো কাঠ, তোর মা তো ওখানেই আছে।'

ট্যাঙ শুকনো ডালের পরে বসে জিজ্ঞেস করল, 'আকাশে গোল কেন হয়?'

কোলাঘ্যাঙ বিবি ঘ্যাঙঘ্যাঙ করে বলল, 'এ কথা আমাকে কেউ বলেনি। তবে আমার বিশ্বাস-পুকুরে যখন চ্যাঙগুলো খুব গোল বাঁধায় তখন তাদের গোল থামানোর জন্য আকাশে গোল তৈরী হয়, মানে-গোল থামানোর গোল আরকি।'

এ কথা শুনে ট্যাঙ আনন্দে হাততালি দিল। উঁকি দিয়ে দেখল আকাশ পরিষ্কার। সে ভাবল, 'চ্যাঙমাছেরা আর গোল করবে না।' ট্যাঙ আনন্দে পুকুরে ঝাঁপ দিল আর বলতে লাগল, 'গোল থামানো গোল/মাছেরা খেলো ঘোল, গোল থামানো গোল/মাছেরা খেলো ঘোল।' আর বলতে না বলতে একটা চ্যাঙের বাচ্চা ট্যাঙের ঠ্যাঙে কামড়ে ধরল। ট্যাঙ ভয়ে 'দাদী...' বলে চিৎকার করে দিল এক লাফ। এক লাফেই ডাঙায় গিয়ে পড়ল। ভ্যাবাচেকা খেয়ে ট্যাঙ ভাবতে লাগল, 'কী হল!...এখনও কি গোল থামেনি?' বলেই আকাশের দিকে তাকাল। দেখল পশ্চিম আকাশে একটু একটু করে মেঘ জমছে। তাই দেখে ঢ্যাঙ ঢ্যাঙ করে নাচতে নাচতে ট্যাঙ কোলাঘ্যাঙ বিবির কাছে গিয়ে বলল, 'শিগগির কাঠগোলায় চলো!'

কোলাঘ্যাঙ বিবি জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

ট্যাঙ বলল, 'চ্যাঙেদের গোল এখনও থামেনি, তাই আকাশে আবার গোল তৈরী হচ্ছে।'

## ঢ্যাঙঢ্যাঙের বুদ্ধি

দেখতে সে ছোট, কিন্তু বুদ্ধিতে বড়। তার চার পা। যখন বুদ্ধি বের করে, তখন এক পা ঘাড়ে উঠে যায়। কী আর করা! তিন ঠ্যাঙে তখন ঢ্যাঙ ঢ্যাঙ করে হাঁটে আর বুদ্ধি বের করে। তাই তার নাম ঢ্যাঙঢ্যাঙ। সে হলো ছোট্ট একটা টিকটিকি।

ঢ্যাঙঢ্যাঙকে হিংসে করে একটা মোরগ। তার নাম দুইঠ্যাঙা। একদিন হয়েছে কী...সে এক ঠ্যাঙ তুলে ঢ্যাঙঢ্যাঙের মতো হাঁটতে গেল। কিন্তু অভ্যেস না থাকলে যা হয়...ঢপ করে পড়ে এক ঠ্যাঙ মচকে ফেলল। দুইঠ্যাঙা পড়ল বিপদে। দুটো মোটে ঠ্যাঙ। তার একটা গেল মচকে। এক ঠ্যাঙে তো আর হাঁটা যায় না।

ওদিকে ঢ্যাঙঢ্যাঙ দিব্যি হাঁটছে। তাই দেখে দুইঠ্যাঙার হিংসে গেল বেড়ে। এবার সে করল কী...একটা শক্ত লাঠি নিল। লাঠি দিয়ে ক্র্যাচের মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। হিংসের জ্বালায় ঢ্যাঙঢ্যাঙকে হাতের মাথায় পেয়ে মারল লাঠির বাড়ি। কিন্তু গায়ে লাগার আগেই ঢ্যাঙঢ্যাঙ দিল এক লাফ। আর এক লাফে উঠে গেল দুইঠ্যাঙার মাথায়। মাথায় উঠে খুব করে ঝুঁটি টানা শুরু করল। দুইঠ্যাঙা তাড়াতাড়ি মাথায় হাত বোলাতে গিয়ে লাঠি ছেড়ে দিল। আর এক পায়ে দাঁড়াতে না পেরে দড়াম করে মাটিতে পড়ে মাজা ভেঙে ফেলল।

দুইঠ্যাঙা পা ভেঙে মাজা মচকে কাহিল হয়ে পড়ল। কিন্তু তার হিংসেটা কাহিল হলো না। সে মুখে ভালো ভালো কথা বলতে লাগল। সে ঢ্যাঙঢ্যাঙকে বলল, 'দেখো ভাই! তোমার সাথে খুব অন্যায়

করেছি, তাই আজ আমার এই অবস্থা। তুমি আমায় ক্ষমা করো! ...দেখো তো ভাই ওই কুয়োয় একটু উঁকি দিয়ে, কই মাছগুলো কেমন আছে, আমি তো উঠতে পারছি না!'

কিন্তু ঢ্যাঙঢ্যাঙ কুয়োর ধারে-কাছে গেল না। কারণ, সে জানে কুয়োর কাছে গেলেই দুইঠ্যাঙা তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে। সে বলল, 'আমি কই মাছের কথা বুঝি, কই মাছ বলছে–আমাদের যে চাষ করেছে, সে হাত-পা ভেঙে পড়ে আছে, ভালোই হয়েছে, এবার আমরা নিশ্চিন্তে পালাতে পারব।'

এ কথা শুনে দুইঠ্যাঙা জোর করে উঠতে গেল। আর ভাঙা মাজায় বেজায় ব্যাথ্যা পেয়ে টলতে টলতে পড়ল কুয়োর মধ্যে। কই মাছেরা কাঁটা ফোঁটাতে লাগল। একটা কই দুইঠ্যাঙার কানে কামড়িয়ে বলল, 'আরে হিংসুটে! তুই ঢ্যাঙঢ্যাঙ-কে কুয়োয় ফেলতে চেয়েছিলি, এখন নিজেই পড়লি!'

দুইঠ্যাঙা গেল আরও ক্ষেপে। সে একটা করে কই মাছ ধরে, আর রাগে ছুঁড়ে ফেলে দেয় কুয়োর বাইরে। ডাঙায় পড়ে মাছগুলো ছটফট করে।

ঢ্যাঙঢ্যাঙ কুয়োর ওপর থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'বাহ! কই মাছগুলো মরছে না, ওদের সব ডানা গজাচ্ছে! পাখির মতো উড়ে যাচ্ছে!'

দুইঠ্যাঙা কুয়োর মধ্যে বসে দেখতে পাচ্ছে না। ঢ্যাঙঢ্যাঙের কথা শুনে সে মাছ ছোঁড়া বন্ধ করে দিল।

ঢ্যাঙঢ্যাঙ বলল, 'ডাঙায় মাছের যেমন ডানা গজায়, কুয়োয় মাছের তেমন শিঙ গজায়! এককেটা শিঙের গুঁতোয় নাড়ি-ভুড়ি বেরিয়ে যায়!'

একথা শুনেই দুইঠ্যাঙা ভয়ে হাউমাউ করে উঠল। একটা করে কই মাছ দেখছে আর ভয়ে মরছে। ওই বুঝি শিঙ গজালো! ওই বুঝি গুঁতিয়ে দিল!

এতক্ষণে তার কুয়ো থেকে ওঠার কথা মনে পড়ল। কিন্তু কিছুতেই উঠতে পারল না। সে কেঁদে-কেটে ঢ্যাঙঢ্যাঙকে বলল, 'আমায় ক্ষমা করো ভাই! না বুঝে তোমার ওপর অন্যায় করেছি, এখন আমি বুঝতে পেরেছি–তুমি কতো ভালো! আমাকে একটু ওপরে তোলো ভাই!'

ঢ্যাঙঢ্যাঙ বলল, 'আমার সে ক্ষমতা নেই, আমি তো ছোট, তুমি দুইঠ্যাঙাদের ডাকো।'

অন্য দুইঠ্যাঙারা সব এসে আহাজারী করতে লাগল। বলল, 'আহা! এ কী অবস্থা তোর! কী করে পড়লি!' তারা মই নামালো, বাঁশ নামালো, মোটা কাছি-দড়ি ঝুলালো। কিন্তু কিছুতেই দুইঠ্যাঙাকে কুয়ো থেকে তুলতে পারল না।

ঢ্যাঙঢ্যাঙ ভাবল, 'বেচারা মরে যাবে–একটু বুদ্ধি বের করে তোলা যাক!' ঢ্যাঙঢ্যাঙ এক ঠ্যাঙ ঘাড়ে তুলে ঢ্যাঙঢেঙিয়ে বলল, 'পেয়েছি! ...তোমরা যদি আমার কথা শোনো, তবে ওকে তোলা যাবে!'

সবাই বলল, 'অবশ্যই শুনব, বলো কী করতে হবে?'

ঢ্যাঙঢ্যাঙ বলল, 'একটা বালতি আনতে হবে।'

বালতি আনা হলো।

'বালতির হাতল কাছি দিয়ে বাঁধতে হবে।'

তাই বাঁধা হলো।

বালতি ফেলা হলো কুয়োর মধ্যে। দুইঠ্যাঙা বালতির মধ্যে গিয়ে বসল। আর সবাই মিলে তাকেসুদ্ধ বালতিটা টেনে ওপরে তুলল। দুইঠ্যাঙা ওপরে উঠেই বলল, 'এই পাজি ঢ্যাঙঢ্যাঙ আমাকে ধাক্কা মেরে কুয়োতে ফেলে দিয়েছে, ওকেও কুয়োর মধ্যে ফেলে দাও!' দুইঠ্যাঙারা সবাই মিলে ঢ্যাঙঢ্যাঙকে ধাক্কা মেরে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিল।

ঢ্যাঙ ঢ্যাঙ কুয়োর তলায় অন্ধকারে পড়ে খুব ভাবতে লাগল। এক ঠ্যাঙ ঘাড়ে তুলে বলল, 'ভালোই হয়েছে, জল তো বেশি নেই, মাছ খেয়ে খেয়ে তাগড়া হওয়া যাবে, কিন্তু কেউ জল ঢাললে আমি মরে যাব!'

এ কথা শুনেই দুইঠ্যাঙারা ভাবতে লাগল, 'তাই তো! এভাবে তো পাজিটা মরবে না, বরং মাছ খেয়ে খেয়ে শরীরে বল করে বেরিয়ে আসবে... জল ঢালতে হবে...জল ঢেলে বুড়িয়ে দিতে হবে কুয়ো!'

দুইঠ্যাঙারা পাশের শ্যালো মেশিনের ড্রেন থেকে কুয়োর মুখ পর্যন্ত একটা নালা কেটে দিল। আর কল কল করে জল পড়তে লাগল

কুয়োর মধ্যে। তাই দেখে দুইঠ্যাঙারা আনন্দ করতে করতে বলল, 'ঢ্যাঙঢ্যাঙ এবার মরবেই মরবে।'

কিন্তু ঢ্যাঙঢ্যাঙ তো জলে ডোবে না। পাতার মতো ভেসে থাকে। জলে কুয়ো যত ভরতি হতে লাগল, ঢ্যাঙঢ্যাঙও তত ভেসে ওপরে উঠতে লাগল। কিন্তু ঢ্যাঙঢ্যাঙ এক কোণায় ঘাপটি মেরে থাকল। নড়াচড়া করল না, যাতে দুইঠ্যাঙারা তাকে দেখতে না পায়। কিছুক্ষণের মধ্যে কুয়ো ছাপিয়ে গেল, আর ঢ্যাঙঢ্যাঙ বেরিয়ে পড়ে তিন লাফে পাশের আনারস বনে লুকলো। দুইঠ্যাঙারা তা দেখতে পেল না।

ঢ্যাঙঢ্যাঙ তার বন্ধু প্রজাপতিকে দিয়ে দুইঠ্যাঙাদের বলতে বলল, 'ঢ্যাঙঢ্যাঙ মরেছে কিনা দেখতে হবে।'

দুইঠ্যাঙারা বলল, 'তাই তো! এত কষ্ট করলাম, হারামজাদাটা মরেছে কিনা দেখা দরকার।'

কিন্তু কুয়ো তো জলে ভরতি। এত জলে কি দেখা যায়? তাই তারা শ্যালো মেশিন ভাড়া করে কুয়ো ছেঁচে ফেলল। আর কুয়োর মধ্যে উঁকি মেরে মেরে ঢ্যাঙঢ্যাঙের দেহ খুঁজতে লাগল। এদিকে জলে জলাকার হওয়ায় সেই যে ডাঙায় ছোঁড়া মাছগুলো–তারা কানকো দিয়ে নড়ে নড়ে কুয়োর দিকে এগোতে লাগল। আর কুয়োর কাছে এসে দুইঠ্যাঙাদের পায়ে ফুটিয়ে দিল কাঁটা। অমনি দুইঠ্যাঙারা হাউমাউ করে পা সরাতে গিয়ে সবাই হড়কে পড়ে গেল কুয়োর মধ্যে। পড়েই সব কাই-মাই শুরু করল। 'বাঁচাও ! তোলো! বাঁচাও!' যেটার পা মচকে মাজা ভেঙে গিয়েছিল, সেটার ওপরে গিয়ে পড়ল আরও দুটো। তাতে বেজায় চাপ খেয়ে সে ''ক্যাক'' করে উঠল। ঢ্যাঙঢ্যাঙ এবার আনারসবন থেকে বেরিয়ে কুয়োর ধারে গিয়ে দু'হাত কোমরে দিয়ে দাঁড়াল। তাকে জ্যান্ত দেখে দুইঠ্যাঙাদের দু'জন এমন অবাক হওয়া হলো যে, তাদের চোখ কপালে নয়, একেবারে মাথায় উঠল। ঠ্যাঙ ভাঙা দুইঠ্যাঙাটা এবার সত্যি সত্যি ক্ষমা চাইতে গেল। কিন্তু কেন জানি ঢ্যাঙঢ্যাঙের কাছে ক্ষমা চাওয়ার শক্তিটাও তার থাকল না।

# পিপির মেয়ে লিকা

তেপান্তরের মাঠে বড় একটা বটগাছ। তার নীচে পিঁপড়েদের পৃথিবী। পিঁপড়েদের ছোট্ট মেয়ে, নাম পিপি। পিপির খুব ইচ্ছে–ওই বটগাছটার মগডালের একবারে শেষ পাতায় উঠবে, যেখানে কেউ আগে যায়নি। কিন্তু মুশকিল হল–পিঁপড়েরা কেউ ওই পাতায় উঠতে পারে না। তাতে যে সময় লাগে, তার অনেক আগেই পিঁপড়েদের জীবন শেষ হয়ে যায়। মানে–বুড়ো হয়ে মরে যায়। ধরো, জন্মিয়েই কোন পিঁপড়ে যদি বটগাছের ওপরের দিকে উঠতে থাকে, তবে চার ভাগের একভাগ যেতেই তার বয়স শেষ হয়ে যায়। তাই পিঁপড়েরা ওই শেষ পাতায় ওঠার আশা বাদ দিয়ে দিয়েছে।

একদিন দুপুরবেলা সবাই খাবার জোগাড় করতে গেছে; শুধু একা পিপি শুয়ে শুয়ে বটগাছ দেখছিল। যতদূর চোখ যায়, সে দেখতে পেল ধুসর সবুজ, আর তার মধ্যে ঢেকে ঢেকে আছে বটগাছের বাদামী গা। যেখানে চোখ যায় না, সেখানে যেন কত কী লুকিয়ে আছে। হঠাৎ পিপির মনে হল ডাল দিয়ে, পাতা দিয়ে, শূণ্য দিয়ে বটগাছটা কাঁদছে। পিপি যাতে ওই পাতাটিতে উঠতে পারে, কেঁদে-কেটে বটগাছটা সে ইচ্ছেই জানাচ্ছে। ...তা কি আর না জানিয়ে পারে? নিজের ওই পাতাটিকে যে বটগাছ নিজেও ছুঁতে পারে না।

ওই পাতার সাথে আকাশটা কী কথা বলে–তাও শুনতে পায় না। রোদ লাগলে পাতাটা কেমন হাসে, বাতাস উঠলে কী আনন্দে দোলে–বটগাছ তাও জানে না।

তাই সেটুকু জানার জন্য সে এই পিঁপড়েদের পেয়েছে। তাই যেন সে ছায়া দিয়ে, পাতা দিয়ে তার গোড়ায় এই পিঁপড়েদের থাকতে দিয়েছে।

এর মধ্যে মা ফিরে এলেন। পিপি মায়ের কাছে ওই পাতাটি ছোঁয়ার ইচ্ছা জানাল। মা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'তার কি উপায় আছে রে মা! আমাদের ছোট জীবন ওই পাতাটিকে ছুঁতে দেয় না।'

মায়ের কথা বিশ্বাস হল পিপির। কিন্তু মানতে পারছে না। কীভাবে ওই শেষ পাতাটা ছোঁয়া যায়, দিন-রাত সেই চিন্তাই করতে লাগল। একদিন চাঁদনি রাতে ঘুম ভেঙে গেলে সে দেখল, বাতাসে বটের পাতাগুলো উড়ছে। তখনই পিপির মাথায় এল– যদি ডানা থাকত, তবে উড়ে উড়ে ওই পাতাটি ছোঁয়া যেত। ডানার চিন্তা করতে করতে কেটে গেল অনেকদিন। ততদিনে মা-ও মারা গিয়েছেন। হঠাৎ একদিন ভোরবেলা পিপি দেখল, সত্যি সত্যি তার ডানা গজিয়েছে। ডানার আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল পিপি। একবার এ পাতায়, একবার ও পাতায়, যেখানে যাওয়া হয়নি– সেই মাঠে উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগল। সেই শেষ পাতায় ওড়ার কথা গেল ভুলে। তারপর একদিন উড়তে উড়তে পিপি দেখল তার ডানা খসে যাচ্ছে। পিপি হয়ে গেল আবার মাটির পিঁপড়ে। ডানা খসে জন্ম নিল ফুটফুটে একটা মেয়ে। পিপি তার নাম রাখল লিকা। লিকা-কে কোলে নিয়ে পিপি কাঁদে, আর ভাবে, 'যখন ডানা ছিল তখন কেন শেষ পাতায় উড়লাম না!' কোলে শুয়ে লিকা মায়ের কান্না দেখে, আর শান্ত হয়ে কী যেন ভাবে।

লিকা বড় হল; এক বসন্তে পিপিও মারা গেল। পাশের ঝোপ থেকে যখন হেনা ফুলের গন্ধ বের হল, লিকার তখন ডানা গজাল। ডানা গজালেই মায়ের কথা মনে পড়ল লিকার। শেষ পাতা ছোঁয়ার জন্য উড়াল দিল সে। ফুলের গন্ধ, মৃদু বাতাস, পাতার নাচ, মাঠের ফাঁকা–সবাই তাকে নিষেধ করল। সে শুনল না। পাতার ফাঁক দিয়ে, ডালের ফাঁক দিয়ে, একটু জিরিয়ে, একটু উড়ে লিকা সত্যিই পৌঁছে গেল সেই শেষ পাতায়। অমনি বটগাছ হেসে উঠল। লিকার গন্ধমাখা

একটা পাতা সেই হাসিতে টুপ করে ঝরে পড়ল মাটিতে। তাতেই সব পিঁপড়েরা খবর পেয়ে গেল।

শেষ পাতার উপরে বসে লিকা শুধুই মায়ের কথা ভাবছে। পিঁপড়ে জাতির ইতিহাসে লিকার নাম লেখা থাকবে সোনার অক্ষরে। কিন্তু তার মা? মায়ের আশা পূরণ করতেই তো সে অসাধ্য সাধন করেছে। ভেবে-টেবে লিকা ঠিক করল, তার নামের আগে মায়ের নাম বসাবে। তাই 'লিকা' হয়ে গেল 'পিপিলিকা'। কোটি বছরের পিঁপড়েদেরকে তাই আজও আমরা 'পিপিলিকা' বলেই ডাকি।

## বন্ধুর কষ্ট

এক শিয়ালের সাথে এক বনবিড়ালের খুব বন্ধুত্ব ছিল। তারা একসাথে খেলা করত, একসাথে ঘুরে বেড়াত। একরাতে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। পুকুরপাড়ের সবেদাগাছ তলায় তারা দুজনে বসে চাঁদ দেখছিল। জোছনায় শিয়ালটার খুব গান গাইতে ইচ্ছে হল। শিয়ালটা পাশের একটা কলাগাছ থেকে কলারপাতা ছিঁড়ে সেটা পেতে শুয়ে পড়ল, আর বনবিড়ালকেও তার পাশে শুতে বলল। ধবধবে সাদা সেই চাঁদনী রাতে ঢেলা ক্ষেতের পাশে সবেদাগাছের অন্ধকারে শুয়ে শিয়ালটা মনের আনন্দে গান গাইতে শুরু করল। আর তখনই বনবিড়ালটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করল।

বন্ধুর কান্না শুনে শিয়াল গান থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে বন্ধু? তুমি কাঁদছ কেন?'

বনবিড়াল কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'তোমার সাথে আর আমার মেশা হবে না বন্ধু, তুমি আমাদের মত বনবিড়াল নও, তাই বাড়ি থেকে তোমার সাথে মিশতে মানা করে দিয়েছে।'

এ কথা শুনে শিয়ালটা খুব কষ্ট পেল। শিয়ালটা তখন বনবিড়ালকে বলল, 'তুমি এক কাজ করো বন্ধু, আমার একটা ছবি এঁকে তোমাদের বাড়িতে টানিয়ে রাখো, তোমার বাবা-মা যদি বকে, তুমি বলবে এটা তো সত্যি সত্যি না, এটা তো ছবি, দেখবে আমার ছবি দেখতে দেখতে তারা একসময় আমাকে তাদের কাছের লোক ভাবতে শুরু করবে, তখন আমার সাথে তুমি মিশলেও তারা তোমাকে বকবে না।'

শিয়ালের কথা বনবিড়ালের খুব ভালো লাগল। কিন্তু ছবি আঁকবে কে? শিয়াল বলল, 'তুমি আমার বন্ধু, আমার ছবি তোমার মতো আর কেউ ভালো আঁকতে পারবে না।'

পরের দিন থেকে বনবিড়াল শিয়ালের ছবি আঁকতে শুরু করল। তাই আর আসল শিয়ালের সাথে মেশার সময় পেল না।

বনবিড়াল তিন মাস ধরে সুন্দর করে বন্ধু শিয়ালের ছবি আঁকল। বাড়ির লোক রাগ করলে সে বলে, 'এটা তো আসল শিয়াল না, এটা তো শুধু ছবি।'

বনবিড়াল শিয়ালের সেই ছবির সাথে দিন কাটাতে লাগল। ছবিটা দেখতে দেখতে বনবিড়ালের বাড়ির লোকগুলোর অভ্যেস হয়ে গেল। তারা শিয়ালের ছবির পাশে বনবিড়ালকে সারাক্ষণ বসে থাকতে দেখে একদিন বলল, 'হ্যারে, তোর বন্ধু সেই আসল শিয়ালটাকে একদিন বাড়িতে ডেকে আন!' এ কথা শুনে বনবিড়াল কেঁদে উঠলো, বলল , 'তোমাদের অযত্নে আমার বন্ধু আসল শিয়াল আমায় ছেড়ে চলে গেছে।'

আসলে শিয়ালটা তো খুব ভাল! সে দেখল, বনবিড়ালদের মতো দেখতে নয় বলে তার সাথে মিশলে যখন বন্ধু বনবিড়ালকে বকুনি শুনতে হয়, সেই দুঃখে সে নিজে থেকে অনেক দূরে হারিয়ে গেল, আর বন্ধু হারানোর দুঃখ ভোলানোর জন্য বনবিড়ালকে নিজের ছবি আঁকানোর কাজ দিয়ে গেলো।

# উম চিকি চিকি

হিমেল জোছনায় ঘুমোচ্ছে খাজার মাঠ। ওই মাঠের মাঝখানে একটা বাবলা গাছ। ওই গাছের মগ ডালে তোসোদের বাড়ি।

মায়ের পেখমের তলায় শুয়ে আছে তোসো। মা ঘুমোচ্ছে। তোসো'র ঘুম আসছে না। ছোট্ট ছোট্ট করে নড়ছে। নড়তে নড়তে টুপ করে মাথা বের করে দিল বাইরে। কুয়াসারা উড়ছে জোছনায়। তোসো হাসিতে হাঁ-করা মুখে দেখে। আকাশে শীতের সাগর। সেই সাগরে গলা ডুবিয়ে বসে আছে চাঁদ। বসে বসে তোসোকে দেখছে। তোসো মাথা কাত করে আকাশে তাকায়। মা খপ করে ঘাড় ধরে।

'অতো নড়ছ কেন তোসো?'

'কই! নড়ছি না তো!'

'দুষ্টমি কোরো না! ঘুমোও! অনেক রাত হয়েছে।'

তোসো চুপ করে। কিন্তু মনটা চুপ থাকছে না। কিছুক্ষণ পরেই নড়া চড়া করে। মাথা চুলকায়।

'মা আমি উড়ব!'

মা কিছু বলে না। মা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

'ও মা শুনছ?' পেখমে ধাক্কা দিয়ে বলে তোসো।

মা ঘুম চোখে উত্তর দেয়, 'হু!'

'আমি উড়ব!'

'তুমি এখনও উড়তে শেখনি, ' হাই-তুলে বলে মা।

'এখনই তো শেখার সময়, মানুষেরা কেউ নেই, ধরে নিয়ে যেতে পারবে না।'

'তুমি পড়ে যাবে, আমি তুলতে পারব না, ঘুমোও তো! বড় হলে উড়ো!' মা'র নাক ডাকছে।

তোসো ভাবে, 'এতক্ষণে কুয়াসারা ডালের কাছে এসে গেছে, জোছনায় হুটোপুটি করছে ...দেখি তো!'

তোসো খরখর করতে করতে ঠোঁট বের করে দেয়। তারপর খানিকক্ষণ চুপ হয়ে দেখে নেয় মা ঘুমোচ্ছে কিনা। না, মা ঘুমোচ্ছে। তোসো এরপর গলা ঠেলে চোখ বের করে। ...বাহ! কী সুন্দর! কুয়াশারা উড়ছে! হাসছে! শীত মাখিয়ে দিচ্ছে জোছনার গায়ে! ...আরে! নীচে জলার মধ্যে একটা ব্যাঙ! জলে ডুবে মুখ বের করে আছে!

তোসো ভাবে, 'কুয়াশাদের পাখা নেই, তবু তারা ওড়ে, আমি কেন পারব না? চাঁদ ঝুলে থাকে আকাশে, পড়ে যায় না, তবে আমি কেন পড়ে যাব? ব্যাঙ ডুবে আছে জলে, শীত লাগে না, তবে আমার কেন শীত লাগবে?'

তোসো মাকে চট করে দেখে নেয়। নাহ্! মা'র নাক সেই ভাবেই ডাকছে!

'যাই ! এই ফাঁকে একটু খেলা করে আসি, ' ভেবেই তোসো উড়ে বসতে গেল সামনের ডালে।

কিন্তু তোসোর তো এখনও ডানা হয়নি। ডাটার মতো হয়েছে সবে। তাই দিয়ে কি ওড়া যায়? ঝটপট করে। ভাসতে পারে না। ডাল থেকে ডালে পড়ে। ডাল ধরতে পারে না। পড়তে পড়তে ঘাড়-মুখ গুঁজে একেবারে ঘাসের মধ্যে গিয়ে পড়ল। বুকটা ধুকধুক করছে। হাঁপাচ্ছে। ঠোঁটটা হাঁ। অন্ধকার মিশে আছে ঘাসে। শিশিরও লুকিয়ে আছে। নতুন জায়গা। সব অচেনা। ওড়ার সুখ ভুলে গিয়ে মনটা খারাপ তোসো'র। মায়ের বারণটা মনের মধ্যে বাজে। বাড়িটা কই? ওইতো মগডাল দেখা যাচ্ছে। না, মা এখনও বুঝতে পারেনি। কত উঁচু! কী করে ফেরা যায়! 'উড়ে ফিরতে হবে, মা দেখবে–আমি উড়তে পেরেছি, উড়তে আমাকে হবেই, আমি ওড়ার জাত, ওড়ার শক্তি আমার রক্তে, আমার কীসের ভয়? মা বলেছে– আমি বড় হলে উড়তে পারব, আমাকে আজকের মধ্যেই বড় হতে হবে, অথবা ওড়া শিখতে হবে, শিখতে আমাকে হবেই! ...উম্ চিকিচিকিচিকি...,' বলেই শূন্যে একটা লাফ দিল তেসো। কিন্তু ঝটপট

করতে করতে কিছু দূর গিয়েই পড়ে গেল। 'বাহ্ ! অনেকটা পেরেছি,' আবার 'উম্ চিকিচিকিচিকি' বলে ডানা ঝাপটালো তোসো। বেশিক্ষণ ভেসে থাকতে হবে বাতাসে। তাই জোরে জোরে ডানা ঝাপটায়। ডানা না, ডানার ডাটা। কিন্তু পড়ে যাচ্ছে তোসো। পড় পড় করতে করতে পড়ল গিয়ে জলার মধ্যে, জলের ধারে। সেখানকার ব্যাঙটা আঁতকে উঠল। 'আরে! পাখির বাচ্চা দেখছি! এখানে কেন? জলে পড়লে তো জমে বরফ হয়ে যাবে! নিশ্চয়ই বাসা থেকে পড়ে গেছে।'

ব্যাঙ জল থেকে মাথা উঁচু করে বলল, 'অ্যাই অ্যাই আর এগিয়ো না! জলে পড়ে যাবে!'

তোসো দাঁড়াতে পারছে না। জলার পাড় ঢালু। গলাটা কাদা-মাটিতে ঠেকানো। ক্যা-ক্যা করে বলল, 'আমি্ উড়তে শিখছি, জল দেখে ভয় পেলে কি হবে?'

'তুমি তো পাখি, উড়তে তুমি পারবেই, এর জন্য আবার শেখার কী? সময় হলে পারবে, কিন্তু এখন উড়তে গেলে জলে পড়বে!'

'তোমার তো কিছু হচ্ছে না! তুমি তো জলে ডুবে আছ।'

'জল তো আমার জায়গা, তোমার তো নয়।'

ব্যাঙের কথায় তোসোর মনে নানা চিন্তা চলে এল।

'আমরা উড়তে পারি, এটাই আমার মনের শক্তি, এই শক্তিই আমাকে উড়িয়ে নেবে, আমি কিন্তু অনেক দূর উড়েও এসেছি।'

'হ্যাঁ মনের শক্তি বড় জিনিস, কিন্তু তোমার তো পালক গজায়নি, তুমি কি বাসা থেকে পড়ে গেছ?'

'না, আমি ইচ্ছে করেই পড়েছি, আমার বিশ্বাস–আমি উড়তে পারব, সেই বিশ্বাসে আমি চেষ্টা করার জন্য নেমেছি।'

তোসোর কথায় ব্যাঙের মুখে হাসি এসে যায়। এ ব্যাঙ সাধারণত হাসে না। সে মধ্য বয়সী। কিন্তু গায়ে প্রচন্ড শক্তি। তার একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে। সে চাঁদের সাথে কথা বলতে পারে। আকাশে যখন চাঁদ থাকে, তার শক্তি দ্বিগুণ হয়। চাঁদ তার গ্রাভিটি দিয়ে শক্তি বাড়িয়ে দেয়। ব্যাঙ মাথা কাত করে চাঁদকে দেখে। চাঁদ বলে, 'তোসো আমার

মায়ায় মুগ্ধ হয়ে উড়তে নেমেছে, ওর কোনো দোষ নেই।'

ব্যাঙ মাথা সোজা করে তোসোর দিকে তাকিয়ে বলে, 'হ্যাঁ-যে চেষ্টা করে প্রকৃতি তাকে সাহায্য করে, প্রকৃতি তাকে সকল সমাধান দেখিয়ে দেয়।'

'তবে? ...আর আমি যদি না উড়ি, তাহলে কীভাবে বাসায় যাব? কীভাবে মায়ের কাছে...'

তোসো মগ ডালের দিকে তাকায়। ডালটা নড়ছে। 'মা কি জেগে গেছে? আমাকে না দেখে মায়ের মনটা খাঁ খাঁ করছে, না জানি মা কত্তো চিন্তা করছে!' এই ভেবে 'উম্ চিকিচিকিচিকি' বলে অন্ধকারে উড়াল দিল তোসো। ফ্লিক ফ্লিক করতে করতে যাচ্ছে। জলা পার হতে বেশ বাকি। তোসোর গতি সোজা বা উপরের দিকে থাকতে পারছে না। গায়ের সব শক্তি ঢেলে ডানা ঝাপটাচ্ছে। কিন্তু গতি নীচের দিকে নামছে, জলের দিকে যাচ্ছে। তাই দেখে ব্যাঙ আঁতকে উঠল। 'সর্বনাশ! ...জলে পড়ে যাচ্ছে! মরে যাবে!'

আকাশের চাঁদ সাথে সাথে ব্যাঙকে বলল, 'আমি সাহায্য করছি, তুমি এগিয়ে যাও! জলদি!'

তোসো জল থেকে মাত্র হাত খানিক উপরে আছে। এক্ষুনি পড়ে যাবে। ওর ডানা ঝাপটানোর শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে জলার চারদিকের দেওয়ালে। ব্যাঙ আর দেরি না করে চার হাত-পা ছুঁড়ে ডুব-সাঁতার কেটে বিদ্যুত বেগে চলে গেল তোসোর ঠিক নীচে। তারপর ডিগবাজি খাওয়ার মতো মাথাটা জলের তলায় ঘুরিয়ে পিছনের পা দুটো জলের উপর ছুঁড়ে দিল তীব্র বেগে। আর তা লাগল পড়ন্ত তোসোর গায়ে। তোসো তো হাল্কা! ব্যাঙের ওই প্রাণ বাঁচানো ধাক্কায় তোসোর উড়তে সুবিধে হল। চোঁ-করে উঠে গেল বাবলা গাছের মগডালে। একবারে বাসার কাছে। গলা দিয়ে ডাল আঁকড়ানোর চেষ্টা করছে। সেই শব্দে মায়ের ঘুম ভেঙে গেল। মা খপ করে ঘাড় ধরে টেনে নিল পেখমের নীচে।

'নড়ে-চড়ে আবার বাইরে গেছ তুমি! পড়ে গেলে সাপ-খোকে খেয়ে ফেলবে!' ঘুমঘুম চোখে রেগে বলল মা। তোসো ব্যাঙের কথা ভাবতে ভাবতে বলল, 'সাপ-খোকে খাবে কী মা, আমি তো উড়তে শিখেছি!'

# মিনু

ঘরের পিছনের দরজা দিয়ে বাগান দেখা যেত। মিনু দরজায় দাঁড়িয়ে ফুল দেখত। পাখি দেখত। ফুলের গন্ধ ভেসে আসত নাকে।...সেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। একটা ফ্রিজ কেনা হয়েছে। সেটা রাখতেই এই অবস্থা।

ইচ্ছে করলেই আর দরজা খোলা যাবে না। দরজা আটকে রেখেছে বড় একটা ফ্রিজ। ভারী ফ্রিজটা ছোট দরজার সাথে আটকে রেখেছে বড় বাগানটা, বাগান থেকে ঝিরিঝিরি বাতাসে আসা ফুলের সুবাসটা।

মা ফ্রিজ পেয়ে খুব খুশি। আজকাল ফ্রিজ না থাকলে হয়? মা ফ্রিজ খোলেন–কখনো প্রয়োজনে, কখনো আমোদে। এটা-ওটা ভরেন। মিনু দাঁড়িয়ে থাকে মায়ের পাশে। গদগদ হয়ে মিনুকে বলেন, 'দেখেছো, কেমন টাটকা সব!' মিনু ভাবে, 'ফ্রিজ প্রয়োজন, যা প্রয়োজন–তার দাবী আগে।' মিনুও মায়ের সাথে ফ্রিজের গায়ে হাত দেয়। তোয়ালে দিয়ে মোছে। হাসে। দরজার কথা ভুলে যায়। ফুল, বাগান, পাখির কথা ঘুমিয়ে থাকে মনের অতলে।

একদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায় মিনুর। চিঁচিঁ একটা শব্দ ঘুমের মধ্যে কানে আসছিল। দূর গ্রাম থেকে বাতাসে গান বাজলে যেমন কখনো আস্তে, কখনো জোরে শোনা যায়–তেমনি।

মিনু বিছানায় শুয়ে কান পেতে থাকে। বাগানের দিক থেকে আসছে শব্দটা। শব্দের ঢেউ মিনুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অতীতে। একটা হলুদ পাখি বাসা বাঁধছিল জামরুলের ডালে। এতদিনে তার ছানা ফুটেছে! সেই ছানাই ডাকছে! যখন খড়কুটো মুখে করে করে বাসা বাঁধছিল পাখিটি, তখন ছানার কথা মনে হতো মিনুর। ছানা দেখার অধীর ইচ্ছা ছিল মনে। ইচ্ছাটা ভুলে গিয়েছিল সে। ভালো ইচ্ছা কি ভুলে গেলে হয়? ভোলা কথা মনে পড়ে, মিনু ভাবে, 'ভুললাম কী করে!' ভুলো কথা মনে পড়ে আনন্দ লাগে মনে। পুরনো নিজেকে ফিরে পেয়ে নতুন লাগে। ভোর, ঘর–নতুন মনে হয়। ক্ষণে ক্ষণে ডেকে যায় পাখির ছানা। আর নতুন ভোরের মতো জেগে যায় স্বপ্নের সাধ। কাউকে কিছু না বলে উঠে পড়ে মিনু। পাঁচিলের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে বাগানে। তখন সূর্য কেবল চোখ মেলেছে পুব আকাশে। তারারা কেবল লুকোতে শুরু করেছে নতুন রোদের মধ্যে। পশ্চিম আকাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দুয়েকটি নিভু নিভু তারা। ডাল-পাতায় শিশির দানা ঝলমলে হচ্ছে। দক্ষিণ থেকে বইছে ঝিরঝিরে হাওয়া। তার সাথে ভেসে আসে ফুলের মিষ্টি গন্ধ, আর পাখির কিচিরমিচির। অনেকদিন পরে আবার বাগান দেখছে মিনু। এতদিন ভুলে ছিল ভেবে কষ্ট লাগছে। এ কষ্টের মধ্যেও একটা আনন্দ রয়েছে।

কিন্তু সেই জামরুল গাছটিই নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে খুব বেমানান একটা বিদ্যুতের খুঁটি। কিছুদিন হলো মিনুদের গ্রামে বিদ্যুত এসেছে। মিনু বিদ্যুতের খুঁটির সামনে খুঁটির মতো নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে। তার মধ্যে আর কিছুই ঢুকছে না। তার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো ফ্রিজে আটকানো দরজার মতো আটকে গেল। ঝাঁকড়া জামরুল গাছটার শূন্যতা ঢাকতে পারেনি খুঁটিটি। সমস্ত শূন্যটা যেন কাঁদছে। অন্ধ ভিখারিনীর মতো জামরুল গাছটিকে হাতড়াচ্ছে। মিনুর কাছে অনুযোগ করছে। যেন কেউ গাছটিকে অহেতুক সরিয়ে রেখেছে।

মিনু ভাবে, 'বিদ্যুতের খুঁটির প্রয়োজন আছে। মানুষের যা প্রয়োজন, তা-ই আগে করা হয়।' কিন্তু অন্য প্রয়োজনও যে আছে–মিনুর মধ্যে সে কথা জোর জাগাল না। তবে মিনুর মধ্যে প্রশ্ন

ওঠে, 'জামরুল গাছটিকে বাঁচিয়ে কি খুঁটিটি পোতা যেত না?' কিন্তু সে কথায় আর কাজ কী এখন? যা হওয়ার তো হয়ে গেছে। হয়তো খুঁটিটি ঘুরিয়ে অন্য কোথাও পুতলে ক্যাবল খরচ বেশি পড়ত। হয়তো ক্যাবল সাশ্রয়ের কথা ভাবতে গিয়ে গাছের জীবন সাশ্রয়ের কথা ভাবেনি কেউ।

মিনু এগাছ-ওগাছের মাথায় দেখল, কোথাও চিঁচিঁ ডাক শুনতে পেল না। কোথাও পাখির ছানা দেখতে পেল না। নিরাশ হয়ে ঘরে ফিরে এল। স্বপ্ন-সাধের কাছ থেকে ফিরে এল। এই ফিরে আসার মধ্যে একটা কষ্ট আছে। তা নিজে বোঝা যায়। কিন্তু নিজের মতো করে অন্যকে বোঝানো যায় না।

তখনো কেউ ওঠেনি। মিনু বালিশে মাথা দিতেই আবার চিঁচিঁ শব্দটা কানে আসতে লাগল। এবার বেশ চিকন কিন্তু ভারী মনে হচ্ছে। কখনো দূর থেকে কাছে, আবার কখনো কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে পাতালপুরীতে কেউ চাপা পড়ে কাঁদছে, তাকে উদ্ধার করা দরকার।

মা তখন উঠব উঠব করছেন। মিনু মায়ের কাছে গিয়ে বলল, 'মা চিঁচিঁ একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছ?' মিনুর কথার গুরুত্ব দিচ্ছেন–এটা বোঝাতে মা কিছুক্ষণ কান পেতে থাকলেন। তারপর হাই তুলে বললেন, 'ও এটা! ...এটা তো বাতাসের শব্দ।' বলেই মা দিনের কাজ শুরু করার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

বাতাস কি গুমরিয়ে গুমরিয়ে ডাকে? নিজের ঘরে খাটে বসে ভাবছে মিনু। মিনু কানটাকে মায়ের হাতে তুলে দিতে পারল। কিন্তু মনটাকে ঠিক পারল না। সেই শব্দটা এবার সুচের মতো কানে খোঁচা দিচ্ছে। সেই খোঁচা পৌঁছে যাচ্ছে বুকের ভেতরে। মিনু ভাবল, 'মা হয়তো ঠিক শুনতে পাননি।' দৌড়ে মায়ের হাত ধরে টানতে টানতে আনল ঘরে। বলল, 'এইখানে দাঁড়াও, ভালো করে শোনো তো! আমি তো শুনতে পাচ্ছি!'

মা হাসতে হাসতে বললেন, 'ওরে পাগলি! বললাম তো এটা বাতাসের শব্দ। দরজা-জানলায় বেধে এমন শব্দ হচ্ছে।...'

মা'র কথায় মিনু মুখটা ভার করে থাকল। তাই দেখে মা মিনুর মুখটা দুহাতে তুলে নিলেন। বললেন, 'তাতে কী হয়েছে?' ...মিনুকে খুশি করার জন্য মিছে মিছি বললেন, 'ও তাইতো! চিঁচিঁ একটা শব্দ হচ্ছে! এবার শুনতে পাচ্ছি! এবার বলোতো, তাতে কী হয়েছে?'

মিনু গদগদ হয়ে আব্দার করল, 'ফ্রিজটা একটু সরাবে? দরজাটা খুলে দিই, দেখি শব্দটা যায় কি না!'

মা ছলাৎ করে উঠে বললেন, 'ওরে বাবা! ও তো সেট করা, সুইচবোর্ড-তার.. নানা সেটা খুব ঝামেলা... আর বললাম তো ওটা বাতাসের শব্দ...'

মিনু বাঁধা দিয়ে বলল, 'তবে যে বললে চিঁচিঁ শব্দ শুনতে পাচ্ছ!'

'হ্যাঁ... বাতাসও চিঁচিঁ শব্দ করে, বাতাস থেমে যাক, দেখবে...'

মিনু এক দৌড়ে জানলা খুলে বলল, 'কই বাতাস তো নেই, দেখো বাতাস নেই।'

মা দেখলেন গাছের পাতা নড়ছে না। কিন্তু মিনুর ভেতরটা তোলপাড় হচ্ছে। মিনু ছলছল চোখ করে বলল, 'আমি তো একেবারে সরাতে বলছি না, একটু খানির জন্য।' মিনুর মুখের দিকে তাকিয়ে মা আর 'না' করতে পারলেন না। মেয়েকে উদ্বিগ্ন রাখতে তিনি চান না। বললেন, 'আচ্ছা! বাবা আসুন, ফ্রিজ সরিয়ে নেব।'

দুপুরে ফ্রিজ সরানো হলো। যারা সরাতে এসেছে, তারা এর কোনো কারণ খুঁজে পেল না। অন্যের অ-কারণ, তাদের দুটো টাকা হওয়ার কারণ, তাদের দুটো টাকা হলেই হলো। তারা ঝটপট ফ্রিজ সরিয়ে ফেলল। আর দরজার গোড়ায় ঝুল-ময়লার মধ্যে দেখা গেল একটা চামচিকে। কালো ফিনফিনে ডানা এলিয়ে হাঁপাচ্ছে। ওড়ার শক্তি নেই। মাথাটা কাঁপাচ্ছে। বুকের কাছটা ঢিমঢিম করছে। কখন কীভাবে ফ্রিজ আর দরজার ফাঁকে আটকে গিয়েছিল।

# বৃষ্টিবাগান

ঝুমবৃষ্টি।

বাগানের ভিটেটা বুক সমান উঁচু, তার নীচের ফাঁকা জমিটা অঝর ধারায় ভিজছে, ভালো দেখা যায় না সব, বৃষ্টিতে ঝাপসা আর ধূসর লাগে। ভিটের বাগানটিও ভিজছে; শুধু বড় একটা আম গাছ বাগান ছাড়িয়ে বৃষ্টিতে মাথা পেতে ওই ফাঁকা জমিটার দিকে তাকিয়ে একমনে বৃষ্টির সংগীত শুনছে। বাগানের ভেতরটা একেবারে ভিজে জবজবে। আনারস বনের মধ্যে বড় একটা কামরাঙা গাছ, বেশ কয়েকটা আম গাছ, একটা কাঁঠাল গাছ, ভিটের ধারের উঁচু লম্বা কয়েকটা নারকেল গাছ, মধ্যে মধ্যে দলা দলা কলার ঝাড়, এক ফোঁটা একটা বাঁশঝাড়, জায়গায় জায়গায় নিসিন্দা, ভাঁটফুল আর করমচার ঝোপ–সবই মেঘবৃষ্টির আঁধার মেখে টুপ-টাপ ভিজছে। করমচার ঝোপ থেকে এঁকে বেঁকে ওঠা শুটকো একটা আম গাছের প্রায় সব জায়গা ভিজে। বড় একখান কলার পাতায় ছেয়ে একটা ডালের একটুখানি কেবল শুকনো। একটা পেঁচা সরতে সরতে সেখানে বসে ঝিমুচ্ছিল। হঠাৎ ঝিমুনি থামিয়ে প্যাঁচপ্যাঁচ করে ডেকে উঠল। তাই শুনে কামরাঙাগাছের ফোকর থেকে একটা বুলবুলি মাথা বের করে হেসে বলল, 'কী ব্যাপার পেঁচাভাই! তোমার লুডু খেলতে ইচ্ছে করছে এখন!'

নারকেলগাছ থেকে রিরি করে নেমে একটা কাঠবিড়ালি আনারস বনের মধ্যে দিয়ে কিটি কিটি করতে করতে ছুটে পুকুর পাড়ের দিকে গেল। কাঁঠাল গাছটার কয়েকটা শিকড় মাটি থেকে বেরিয়ে পুকুরের

জলের উপর মাচার মত হয়ে আছে। ওখানে পা ঝুলিয়ে বসলে বুড়ো আঙুলে পুকুরের জল ঠেকে। কাঠবিড়ালিটা কী ভেবে ছুটে ওই শিকড়ের মাথায় যেয়ে দাঁত ফোঁকলা খুকির মত হেসে ধূসর আকাশ থেকে বৃষ্টিপড়া দেখে হুট করে আবার ছুটে নারকেলগাছে উঠে গেল। কতকগুলো ডানকানা মাছ ওই শিকড়ের তলার জলে খেলা করবে বলে দল পাকাচ্ছিল, হুট করে কাঠবিড়ালি দেখে খেকিয়ে দাপিয়ে পুকুরের মাঝখানে চলে গেল। বৃষ্টির কী মোটা মোটা টোপ! মাথা রাখা যাচ্ছে না! ডুব সাঁতার দিয়ে ওই দিকের তালগাছের পাড়ের কাছে চলে গেল।

বুকে থু থু দিয়ে পেঁচা বলল, ‘কাঠবিড়ালিটার জন্যে বুকের জল শুকিয়ে যায় একেবারে! এই বৃষ্টি বাদলে ওর ছুটোছুটি করার কী দরকার? ...তা যা বলেছো বুলবুলি ভায়া! এমন বৃষ্টিতে বসে না থেকে একটু-আধটু লুডু খেললে ভালো হয়!’

বাঁশ ঝাড় থেকে একটা কঞ্চি হেলে কামরাঙ্গা গাছের ডালে ঠেকেছে। উপর দিয়ে মোটা একটা আমের ডালের জন্য কঞ্চির মাঝখানে এক জায়গায় বৃষ্টির জল পড়ছে না। বাকি সব জায়গায় টুপটুপ করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে ভেঙে গিয়ে ছাঁটগুলো ছিটকে পড়ছে নীচে। কীসের উপর পড়ছে? কলাগাছের গোড়ায় ভিজে মাটিতে একটা বোকা-শোকা ব্যাঙ ওপর-মুখো হয়ে বসে আছে, তার মাথায় গিয়ে পড়ছে! আনারস বাগান থেকে উড়ে ভিজে একটা শালিক কঞ্চির ঐখানে বসে গা চুলকোচ্ছিল। পেঁচার কথায় হঠাৎ চুলকানি থামিয়ে মনে মনে গজগজ করে উঠল, ‘খেয়েদেয়ে কাজ নেই লুডু খেলা লেগেছে এখন! ...যা দু-একটা কেঁচো উঠত, ফ্যাচফ্যাচটার জন্য আর উঠবে না!’ একটা আধ-ভেজা কুকুর হাউমাউ করে এসে একবার এগাছের গোড়ায়-একবার ওগাছের গোড়ায়, কোথাও শুকনো জায়গা না পেয়ে টিং টিং করতে করতে বাগান পেরিয়ে আবুলের বাড়ির দিকে যাচ্ছে। বৃষ্টিতে পুকুরের ওই পাড়ে ভঞ্জদের বাড়ির কাঠঘরের বারান্দায় একটু ঠাঁই নিয়েছিল কুকুরটা। বৃষ্টি-কাদা-জলে উঠোনে ফুটবল খেলছিল ছেলেরা।

একটা বিচ্ছু ছেলের রাম-কিক খেয়ে বলটা সজোরে ধাঁই করে কুকুরের পাছায় আছড়ে পড়ে, আর কাই-মাই করে কুকুরটা কোথায় যায় কোথায় যায় ভেবে না পেয়ে হুড় মুড়িয়ে একেবারে এই বাগানের দিকে চলে এসেছিল। ঝমঝম বৃষ্টিতে বুলবুলিটা কেবল একটা গান ধরতে গিয়েছিল, কুকুর দেখে চোখ দাঁড়িয়ে গেল! টুপ করে ফোকরের মধ্যে লুকিয়েছিল। এখন আবার মাথা বের করে বলল, 'পেঁচা ভাই! হারামজাদা খেঁকিটা বৃষ্টির মধ্যে এদিকে এসেছিল কেন গো!'

'আর বলো না! আমিও ভয়ে জমে গিয়েছিলাম! লুডু-ফুডু মাথা থেকে চলে গিয়েছিল! তবে হারামজাদাটা আজ আর উপরের দিকে তাকায়নি, মনে হয় বেজায় তাড়া খেয়ে এসেছিল!'

'আচ্ছা! ইঁদুরগুলো কি আলসে হয়ে গেছে?' বেশ একটা পন্ডিতি ভাব করে বলল বুলবুলি।

'কেন বলতো?'

'নারকেলের বোঁটাগুলো বৃষ্টিতে নরম হয়ে আছে, দু একটা কামড় দিলে ঢপঢপ করে নিচে পড়তো! একটা না একটা তো কুকুরের পিঠে পড়তো, নাকি? তাহলে তো কুকুরটা ভয়ে আর এ পথ মাড়াত না!'

'এঃ ! কী বুদ্ধি তোমার!'

'কেন!' হঠাৎ মুখটা অন্ধকার হয়ে গেল বুলবুলির।

'নারকেল পড়লে, কুড়োতে চলে আসবে বিচ্ছু ছেলেপিলের দল, লুডু খেলা বাদ দিয়ে দাবড়ানি খেয়ে খেয়ে মরতে হবে তখন!'

'বৃষ্টির মধ্যে কি আর শুনতে পাবে?'

'পাবে না মানে! মানুষের কান, বুঝলে? তোমার আমার সূচের আগার মতো কান নয়!'

তালগাছের ঐ পাশ দিয়ে কচু আর পেঁপে ক্ষেতের মধ্যে বুক পর্যন্ত ডুবে কাকভেজা হয়ে আসছে একটা লোক। মাথায় একটা কলারপাতা, বৃষ্টি মানাচ্ছে না, হাতে ছিপ। ঝুপ-ঝাপ করে এই বাগানে ঢুকে পুকুর পাড়ের দিকে চলে গেল। লোকটা মধ্য বয়সী, কালো রঙ, অকারণ

কলারপাতা রেখেছে মাথায়। ঠিক-ঠাক হয়ে ছিপটা বাগিয়ে কাঁঠালের ওই শিকড়ের ওপর কেবল বসতে যাবে, অমনি পা হড়কে কাত হয়ে পড়ল জলে। যে ক'টা মাছ ছিল ওখানে, চিৎকার ছেড়ে 'পালাপালা' বলতে বলতে ছুটে চলে গেল। লোকটা ছিপসুদ্ধ হাচড়-পাচড় করে উঠেই, 'এত বৃষ্টিতে ফাতনা মাছে ডোবাচ্ছে, না বৃষ্টিতে ডোবাচ্ছে বোঝা যাবে না, দরকার নেই মাছে! ...অ্যাই বাবু গামছা দে!' বলতে বলতে যে পথে এসেছিল, ঠিক সেই পথ দিয়েই চলে যাচ্ছে।

পুকুরপাড়ে দুটো ভিজে পচপচে কলা গাছের পাশে সজনে গাছের ডালে 'মাছমাছ' বলে ডেকে উঠল একটা মাছরাঙ্গা। শুনতে ওরকম লাগলেও আসলে এটা ওর 'হুঃ-হাঃ' করে হাসি।

'অ্যাই কেরে কেরে!' বেজায় চমকে উঠল বুলবুলি।

পুকুরপাড় দিয়ে সরু একটা পায়ে হাঁটা পথ চলে গেছে। দুপাশের বুনো ওল আর ঘাস-লতা বৃষ্টিতে গা এলিয়ে পথটাকে আরও সরু করে ফেলেছে। বৃষ্টির জলের চিকন একটা ধারা বয়ে যাচ্ছে ওই পথে। এক জায়গায় পাতলা জলধারার নীচে কাঁকর আর লালচে খোলা দেখা যায়। তারপাশে জলের দাগের উপর কচুর পাতার নীচে বসেছিল একটা কোলাব্যাঙ। জল ধরে রাখতে না পেরে পাশের কলাগাছ থেকে কলকল করে যেই খানিকটা জল পড়েছিল কোলা ব্যাঙের মাথায়, অমনি 'অ্যাৎ' বলে লাফিয়ে সরে যেতে চেয়েছিল সে। কিন্তু দড়াম করে পড়ল পুকুরের মধ্যে জলের ধারে। পড়েই হুদ্দম বৃষ্টিতে বোম হয়ে বসেছিল। মাছরাঙাটার ঘুম মতো এসেছিল। ব্যাঙের আছাড় খাওয়া দেখে 'হুঃ-হাঃ' করে হেসে উঠল। ব্যাঙটা পরে পুকুর ধারের বৃষ্টি ধোয়া কাঁকর-মাটি বেয়ে এঁকে-বেঁকে হেঁটে হেঁটে পাড়ের ওপরে ঘাসের মধ্যে উঠল। কিন্তু মাছরাঙার হাসি দেখে বেজায় লজ্জা পেয়ে গেল সে।

বুলবুলি বলল, 'উজবুক মাছরাঙাটা এমন চিৎকার ছেড়ে হাসল কেন বলো তো!'

'উন্মাদ! পাগল!' সমঝদারের মতো বলল পেঁচা, 'মাছ না পেয়ে পেয়ে শোকে হাসছে!'

বাঁশ ঝাড়ের কাছে ভিজে ছায়াটা কালো হয়ে উঠেছে। ওখানে সরু একটা আমগাছে জড়িয়ে উঠেছে একটা পানের লতা। পানের বড় একটা পাতায় টুপ-টুপ করে মোটা মোটা জলের ফোঁটা পড়ছে। ধাক্কায় পানের বোঁটায় একটা লাল পিঁপড়ে মোটে কায়দা করতে পারছে না। এক পা উঠছে, তো দু-পা পড়ছে। ছিটকে যাতে না যায়, আঁকড়ে ঝুলে পড়ছে মাঝে মাঝে। তাই দেখে পেঁচা বলল, 'বুদ্ধুরাম পিঁপড়েটার কান্ড দেখেছ! ঝাঁকুনি হচ্ছে, তোর বোঁটা বেয়ে ওঠার কী দরকার! দেখতে পেলে শালিকটা যে গিলে খাবে!'

বাঁশঝাড় থেকে সাঁইসাঁই করে উড়ে একটা বাদুড় পেঁচার পাশে একটা হেলে পড়া কলা গাছের মোচায় দু'একটা আঁচড় দিয়ে আবার ফিরে গেল। বৃষ্টিতে দাঁড়াতেই পারল না। আঁচড় দেওয়ার সময় দুবার কিটকিট করে পেঁচার দিকে তাকিয়ে ছিল। ভয়ে পেঁচার মুখে কথা বন্ধ হয়ে গেল।

বুলবুলি বলল, 'আরে বাপ! পেত্নি বাদুড়টা কি তোমায় ধরতে এসেছিল?'

কথা বলছে না পেঁচা।

'বড্ড ভয় পেয়ে গেছ! একটু বৃষ্টির জল খেয়ে নাও তো দেখি! ঠিক হয়ে যাবে।'

তবু কথা বলছে না পেঁচা। ...বৃষ্টি শুধু হয়েই চলেছে, হয়েই চলেছে, হয়েই চলেছে।

স মা প্ত

খোলামাঠ, গভীর আকাশ, নির্জন বনপথ, নির্মল বাতাস–গ্রামের এই পরিবেশেই বাবলু ভঞ্জ চৌধুরীর জন্ম। বেড়ে ওঠাও ওই পরিবেশে। রোদের বাহার, বাতাসের স্বর, বৃষ্টির সুর, আকাশের দূর-ছোটবেলা থেকেই তাঁর মনে চীরকালীন মানুষের বিস্ময়, মুগ্ধতা, বন্দনাবোধ এবং প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। তারই জন্যে; এবং সেই সাথে প্রকৃতিতে যে রুপ ও রঙের শিল্প আপনি ফুটে থাকে, সেই শিল্পসত্ত্বার খানিকটা পেয়েই যেন লেখালেখির আত্ম-তাগিদ। তা খুব ছোটবেলা থেকেই। ক্লাস ফোরেই নববর্ষার দিনে প্রকৃতি বন্দনা, কবিতা দিয়ে। ক্লাস সিক্সেই রেডিও শুনে শুনে সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে লেখা; কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, ব্রুনো নিয়ে লিখে লিখে অঙ্কের খাতা ভরানো; আর মাকে পড়ানো। ক্লাস এইটেই বোঝা না বোঝার রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র সংগীতের সুর তাঁর মধ্যে নিজস্ব অধ্যাত্মবোধের ঝড় তুলেছিল। ক্লাস এইটেই প্রথম পূর্ণাঙ্গ গল্প, অষ্টআশির প্রলয়ংকরী ঝড়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে, 'ঝড়ের ছোবল' প্রকাশিত হয়েছিল স্কুল ম্যাগাজিনে। তারপর বাইরে আসেনি কিছু, দীর্ঘ বিরতী। তবে লেখার খাতায় জমা হত মাঝে মাঝে। চল্লিশে এসে নবজাগরণ। বিভিন্ন নামি পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির শুরু। এখনও চলছে তা অবাধে। প্রথম গ্রন্থের প্রকাশ ২০১৭ সালে, 'ভূতের শহর দেখা'; দ্বিতীয় গ্রন্থের প্রকাশ ২০১৮-তে 'তককো ও ফককো'। তাঁর ভাষা বিচিত্রগামী। ভাষার পাত্রে চিন্তাগুলোকে এমন ভাবে নিজস্ব ঢঙে সাজিয়ে রাখেন যে, তাঁর মতো করেই পাঠক মাত্রই তা বুঝতে পারেন। এখানেই তাঁর লেখনির শক্তি; আর এই কারিশমাই তাঁর বড় অলঙ্কার। সাহিত্যের সকল শাখাতেই বিচরণ। বড়দের জন্যও লিখে চলেছেন সমান তালে। জলবায়ু পরিবর্তন ও কল্পবিজ্ঞান তাঁর প্রিয় বিষয়। খুলনার 'মৃৎ' পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত কল্পবিজ্ঞানধর্মী তাঁর 'ফালো' গল্পটি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। সত্যজিৎ রায় আর সেলিনা হোসেন তাঁর আদর্শ। লেখালেখির পাশাপাশি গল্পের অডিও সংস্করণ নিয়েও কাজ করে যাচ্ছেন। Suspense station নামে ইউটিউবে একটি চ্যানেল আছে তাঁর। এখানে নিজের ও অন্যান্য লেখকদের লেখা-গল্প শোনাচ্ছেন নিয়মিত।

সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ শ্রীপুর গ্রামে ৩০ এপ্রিল, ১৯৭৫ সালে জন্মেছিলেন তিনি। বাবা অসীম ভঞ্জ চৌধুরী; মা রীতা ভঞ্জ চৌধুরী। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর, বর্তমানে একটি সরকারি সংস্থায় কর্মরত।

ডাংগুলি
একটি শিশু-কিশোর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০